KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 5/6 5/7-8 5/9 5/10 5/11 5/12	Year of Publication : আশ্বিন ১৩২৫ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৫ পৌষ ১৩২৫ মাঘ ১৩২৫ ফাল্গুন ১৩২৫ চৈত্র ১৩২৫ Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

ভূতের বোঝা।

—:০:—

মানুষ যাহাই কিছু হোক না কেন, তাহার মনুষ্যত্বটা যে একটা ভূতের বোঝা ভিন্ন আর কিছু নয়, এটা একটা অবশ্যই খুব জবর সত্য। এই ভূত শব্দটায় যে শ্মশান ঘাটের বিভীষিকাময় বস্তুটিকে অথবা অবস্তুটিকে বুঝাইবে না, এটা বলা কতক বাহুল্য, কারণ বস্তু ভাবে ধরিলে, ওটা হইয়া দাঁড়ায় মনুষ্যত্বের অপভ্রংশ, আর অবস্তু ভাবে দেখিলে ওটাকে নর-মস্তিষ্কের অপব্যবহারই বলা চলে। অপ-ভ্রংশ হইবামাত্র, ওটা অবশ্য তখনই আমাদের গণনার বাহিরে গিয়া পড়ে, কারণ আমাদের কথা হইতেছে মনুষ্যত্বের আসল মূর্ত্তি সম্পর্কে, ইহা তাহার অপভ্রংশ বা নকলের কোন পিতামহীর মুখ-নিঃসৃত রোমাঞ্চকর ইতিহাস নয়। তবে অপব্যবহার হইলে, ওটাকে একে-বারে ঝাড়ান একটু যেন শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন, আমাদের যাহা কিছু ব্যাপার এইরূপ অপব্যবহারেরই একটা প্রকাণ্ড সমষ্টি মাত্র। বৃক্ষশাখায় ভূতের চরণ-ভ্রমের মত অথবা তাত্ত্বিক ভাষায় রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত আমরা ও আমাদের এই বিশাল বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি সবই ফক্কিকার। এই তথ্য আমাদের সবল মনের উপর তেমন গাড়িয়া বসিতে না পারুক, ইহার দার্শনিক ভিত্তিটা নাকি খুব পোক্ত। তবে এই ভ্রমবাদীদেরও নিজেদের খাওয়া-পরা থেকে সমস্ত কাজ কারবারের জন্য তাঁহাদের সেই খেয়ালের হাওয়ায়-ওড়া ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া একটা ভারী ও শক্ত ব্যবহারিক জগতের নিতান্ত

প্রয়োজন। এখন এই বর্ত্তমান আলোচনা যখন এই ভারী ও শক্ত ব্যবহারিক জগৎটার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, তখন ইহার সহিত যে কোন প্রকার ভৌতিক বা তাত্ত্বিক অপব্যবহারের কোন সম্বন্ধ নাই, এটা আর বেশী না বলিলেও চলিবে।

যাই হৌক, ওঝার ভূতদের বাদ দিলেও বৈজ্ঞানিকের পাঁচটীকে কখনই এড়ান যাইবে না। এই পাঁচটী ভূতে মিলিয়া আমাদের মন গড়িতে পারিয়াছে কিনা, এ সম্বন্ধে মতে মতে লাঠালাঠি থাকিলেও এরা যে আমাদের দেহ গড়িয়াছে, ইহা অবশ্যই সর্ব্ববাদিসম্মত। তবে এরা এখন আর ভূত নয়, ভূতের বাবা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের অপত্য ভাগ্যও বড় কম নয়, ভূত এখন পাঁচটা থেকে আশী ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন ভূতকেই এ নাগাদ তাহার বাপের শ্রাদ্ধ করিতে হয় নাই, ভূতেদের পিতৃপুরুষেরা এখনও সকলেই সশরীরে বর্ত্তমান। সুতরাং এত গুলোর নাম না করিয়া আমরা যদি পাঁচটাই ধরি, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বরং আমাদের সভ্যতার কায়দায়, যদিও এখন সেটা একটু বিগড়াইতেছে, কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্যমানে ছেলেদের আমল দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ।

এখন এই পাঁচটা ভূত আমাদের দেহ ছাড়া মন গড়িতে পারুক আর না পারুক, ইহারা যে সাধ্যমত আমাদের মনের খোরাক যোগায়, এটা ঠিক। কিন্তু এরা আমাদের মনের খোরাক যোগায় বলিয়া আমাদের মনুষ্যত্বের মসলা যোগায়, এতটা অবশ্য বলা চলে না। এরা মনের যে খোরাক যোগায়, সেই গুলোই একেবারে যদি আমাদের মনুষ্যত্বের উপাদান হইত, তবে হাতী, ঘোড়া, ইঁদুর, বাঁদর, চামচিকে পর্য্যন্ত সবই মানুষ হইয়া যাইত। অর্থাৎ মানুষের আকার

না পাইয়াও মানুষের মনোবৃত্তি লাভ করিত। কারণ এই পাঁচটা কেবল আমাদেরই মনের খোরাক যোগায়, তাহাই নয়, ইহারা ছোট বড় সকল প্রাণীরই মনের খোরাক যোগাইয়া থাকে।

আসল কথাটা এই যে, এই পাঁচটা ভূত নিজেদের স্বরূপে থাকিয়াই হৌক আর নানা রকম রূপ ধরিয়াই হৌক, আমাদের মনের যে খোরাক যোগায়, তাহার উপর নয়, সেটাকে হজম করিবার শক্তির উপরেই আমাদের মনুষ্যত্ব অবস্থিত। এই খোরাক সম্বন্ধে মানুষ যাহা পায়,—অশ্বও প্রায় তাহাই পায়, কিন্তু সেটাকে হজম করিবার শক্তি উভয়ের মধ্যে বেজায় বিভিন্ন। অশ্বের মানসিক হজমী শক্তিতে খোরাকগুলো অশ্বত্বে পরিণত হয়, আর মানব মনের পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যে সে গুলো মনুষ্যত্ব গড়িয়া তোলে। এই পঞ্চভূতাত্মিকা প্রকৃতি আমাদের মনুষ্যত্ব গঠনে গৌণ ভাবে সাহায্য করে বটে, কিন্তু সেটা গড়িবার ভার আসলে যে আমাদের মনের শক্তিরই উপর, ইহা লইয়া কোন রকম তাত্ত্বিক বা অতাত্ত্বিক বাদানুবাদের বোধ হয় সম্ভাবনা নাই।

এখন মানুষ কবে থেকে তাহার মনুষ্যত্ব গড়িবার কাজে লাগিয়াছে, এ কথাটার উত্তর অবশ্য খুব সহজ। সুলভই হৌক আর দুর্লভই হৌক, মনুষ্যজন্ম মানুষ যেদিন পাইয়াছে, সেইদিন হইতেই তাহার এই গড়া-পেটার কার্য্য আরম্ভ। এমন সাদা কথায় কি আর ঘোরপেঁচ আছে? আমাদের মনুষ্য জন্ম লাভের ব্যাপারটা এমন ভাবে এই পর্য্যন্ত বলা থাকিলে কোনই ঘোরপেঁচ নাই সত্য, কিন্তু এই ব্যাপারটার আর এক ধাপ উপরে উঠিলেই মহাগণ্ডগোল। মনুষ্য জন্ম থেকেই মানুষের মনুষ্যত্বের সুরু, ইহাতে আর সন্দেহ কি; কিন্তু এই মানুষটা

পূর্ব্বে ছিল কোথায়, আর এই পঞ্চভূতাত্মিকা প্রকৃতির মধ্যে তাহার জন্মটাই বা কেমন করিয়া হইল, এ সব সমস্যা অবশ্যই যেমন জটিল, তেমনি কুটিল, আর তাহার পূরণের পথ একটুও সোজা নয়।

জটিলা ও কুটিলা শ্রীরাধাকে যে বিষম নির্য্যাতন করিয়াছিলেন, আদি মানবের কুলপঞ্জিকার উপর এই জটিলা সমস্যা ও তাহার কুটিলা পূরণ ক্রিয়ার নির্য্যাতনটি তাহার চেয়ে একটুও কম নয়। কেহ মানুষটাকে উপর থেকে টানিয়া নামাইয়াছেন, কেহ তাহাকে নীচে থেকে হিঁচড়িয়া উপরে তুলিয়াছেন। কেহ বলেন, ওটা চিন্ময় সত্তারই অবনতি, আর কাহারও মতে, ওটা মৃন্ময় সত্তারই উন্নতি। অধ্যাত্ম-বাদে উনি পরমাত্মার অংশ, পঞ্চভূতের পাল্লায় পড়িয়া জড়ীভূত হইয়া গিয়াছেন। জড়বাদে পঞ্চভূতই অসংখ্য প্রাণীবংশের ভিতর রূপান্তরিত হইতে হইতে এমন ধীশক্তি সম্পন্ন মানবের আকার ধারণ করিয়াছে। দুইটা সাপ যদি উভয় উভয়কে গিলিতে আরম্ভ করে তবে শেষে দাঁড়ায় কি? জড় ও অজড়ের বিবাদটাও বুঝি এই রকম কিছু। জটিলা কুটিলা শ্রীরাধাকে দিয়া ফুটো কলসীতেও নাকি জল আনাইয়াছিল, এই নরোৎপত্তির ব্যাখ্যাগুলোও যে সব অছিদ্র নয়, এটাও অবশ্যই ঠিক। আর ইংরাজী ইডিয়ম অনুসারে কোন্‌টা যে কতটা জল ধারণ করে, সেটা পণ্ডিত জনেরই বিচার্য্য।

আমরা এখন ভূতের বোঝা লইয়াই ব্যস্ত, এরূপ বিচারশীল হইবার আমাদের অবসর নাই, সম্ভবত বিদ্যাও নাই। যখনই যে ভাবে আসুক না, মানুষ যে আসিয়াছে, এটা ত আর তর্কের বিষয় নয়। মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াও যাহারা যুক্তির ডিনামাইটে—নিজের ঘৃত দুগ্ধ পরিপুষ্ট তৈল নিষিক্ত এমন সাধের শরীরটা সমেত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা উড়াইয়া

দেন, তাঁহারা ত মন বা আত্মা বলিয়া একটা কিছু মানেন। কারণ এই মন যদি না থাকে, তবে ওই যুক্তিটি বাহির হইবে কোথা হইতে? আমরা যে বোঝার কথা বলিতেছি অবশ্য সেটা দেহের নয়, মনেরই বোঝা। বিশ্বটা মিথ্যাই হৌক আর সত্যই হৌক, যে দিন সেটার সঙ্গে এই মনের সম্পর্ক ঘটিয়াছে, সেইদিন হইতেই এই বোঝার পত্তন। আমাদের এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত হইতে এক অনন্ত—অনন্ত যদি নাও হয়, তবু আমাদের সমস্ত জল্পনা কল্পনার অনধিগম্য—এক অপরিমেয় ভূত কত শত যুগ যুগান্তের মধ্য দিয়া প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। এই বিরাট বিশাল ভূতের আমরা কতটুকু খবর পাইয়াছি? পুরাণ ও ব্যাকরণের মতে, মনু পর্য্যন্ত হইল আমাদের দৌড়। আমরা এ ক্ষেত্রে ব্যাকরণ যাহা বলে, সেইটাই খুব স্পষ্ট ও প্রবল মনে করি। কারণ পুরাণের মনু লইয়া বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক নানা ব্যাখ্যা চলিতে পারে, আবার দর্শনের সঙ্গেও পুরাণের হয়ত গরমিল ঘটিতে পারে, কিন্তু ব্যাকরণ এখানে এক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা মনু লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আবার হনু পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছেন। যাই হৌক আমাদের এই প্রবন্ধে মনুবাদী বা হনুবাদী কোন পক্ষেই দাঁড়াইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের পশ্চাতে যে প্রকাণ্ড ভূত পড়িয়া রহিয়াছে, সেইটাই আমাদের এখন চিন্তনীয়, সেই ভূতের গোড়ায় কে আছে তাহা নাই বা দেখিলাম। যে শুধু কোন একটা বোঝা পরখ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে সেই বোঝাটা মেটেল না বেলে, কোন রকম জমির উপর সাজান, এটা না জানা থাকিলেও ত কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না।

যে ভূতের কথা এখন পাড়া গেল, এটি স্বর্গধামের বাসীন্দা না

হইয়াও অমর। ইহা গত হয় বটে, কিন্তু একেবারে মরে না। ইহার আবির্ভাবকে ইহার জন্ম বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার তিরোভাবকে মৃত্যু বলা যায় না। বরং এই তিরোভাবের পরেই অনেক সময় ইহার প্রতাপ বহুগুণ বাড়িয়া যায়। আমাদের এই জড়দেহের মত কাল যেন ইহার একটা বাহিরের আবরণ। আমাদের এই জড়দেহের তিরোভাবের পর আত্মা বলিয়া যে জিনিষটা থাকে, ইচ্ছা করিলে তাহাকে কেহ নাও মানিতে পারে, কিন্তু একটা কালের অপসরণের পর তাহার এরূপ আত্মার অস্তিত্বে কাহারও অবিশ্বাস করিবার জো নাই। দেহের অবসানে মানবাত্মার বাসস্থান লইয়া কতই না বিতণ্ডা, কিন্তু এই কালাত্মার—শব্দটা অবশ্যই দার্শনিক নয়, নিতান্তই মনগড়া—সম্বন্ধে কোন কথা কাটাকাটিরই সম্ভাবনা নাই। কারণ ওটা স্বর্গেও ওঠে না, নরকেও নামে না—একেবারে আড্ডা গাড়িয়া বসে, যে মনের সাহায্যে মানুষ তর্ক করিবে, তাহারই ভিতর। যে সরিষা-পড়া দিয়া মানুষের নিজের আত্মাকে পর্য্যন্ত উড়াইয়া দেয়, সে সরিষা-পড়া কিন্তু এই কালাত্মার বেলা খাটে না, কারণ এস্থলে যাহাকে তাড়ান যাইবে, সে সেই সরিষার ভিতরেই কায়েমী ভাবে অবস্থিত।

আমাদের মন এক অখণ্ড হইলেও, তাহার শক্তি অবশ্যই বহুধা বিভক্ত। এই শক্তির মধ্যে কোনটি বিচার করে, কোনটি কল্পনা করে, কোনটি উদ্ভাবন করে, এই রকম আরও কত শক্তি কত কাজে লাগিয়া থাকে। কিন্তু এই সব শক্তির কাজ একটি শক্তির বিহনে মাটি হইয়া যাইতে পারে। এই শক্তিটিকে আমরা খুব উচ্চ আসন দিই না বটে, কিন্তু ইনি মসলা না যোগাইলে যে, সকল শক্তিকেই প্রায় হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, এ বিষয়ে বড় সন্দেহ নাই। আর

এইরূপ অকেজো জড়ভরত হইয়া বসিয়া থাকিলে যে সকলকেই মুষড়াইয়া যাইতে হইত এবং ক্রমে হয়ত পাততাড়ি গুটাইয়া এমন সাধের নৃ-মনোধাম ত্যাগ করিতে হইত, এটাও কতক ঠিক। এটি আর কেহ নয়, এটি স্মৃতিশক্তি। শক্তির মধ্যে এটি তেমন নামজাদা না হোক, কিন্তু ইহার কাজ একটুও তুচ্ছ নয়। দার্শনিকের চিন্তাই বল, কবির কল্পনাই বল, রচয়িতার উদ্ভাবনাই বল, এই স্মৃতি না থাকিলে কোনটিই খুলিত না। চিন্তাটা দেশলাইয়ের কাঠির মত ফোঁস করিয়া উঠিয়াই নিভিয়া যাইত, কল্পনা একটু পাখা নাড়া দিয়াই ঘাড়মুচড়াইয়া পড়িত, উদ্ভাবন থেই হারাইয়া সব লণ্ডভণ্ড করিয়া বসিত। যে শক্তি যখন যে কাজ করে, তখনই তাহা স্মৃতির ভাণ্ডারজাত হয়। আবার এই সঞ্চিত ফলটাই সব শক্তির কাজের মূলধন যোগায়। চিন্তা মানুষকে প্রবুদ্ধ করে, কল্পনা বিমুগ্ধ করে, উদ্ভাবনা পরিপুষ্ট করে। স্মৃতি অবশ্য তেমন কিছু উঁচু কাজ করে না, কিন্তু তাহা হইলেও স্মৃতি নহিলে কোন শক্তিই স্ফূর্ত্তি পায় না। সকল শক্তিরই স্মৃতি ছাড়া 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। আমাদের মন ন্যায়ালঙ্কারই হোক, আর কাব্যতীর্থই হোক কিংবা মস্ত একটা আবিষ্কারক ডি এস্ সি-ই হোক, তাহাকে স্মৃতিরত্ন হওয়া-ই চাই।

যে-কাল আমাদের সম্পর্ক বিরহিত হইয়া কোন অজ্ঞাত বিশ্বের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে, তাহার সম্বন্ধে অবশ্যই আমাদের কোন কথা নাই। সে-কাল যেন আমাদের কাছে কতকটা কূটস্থ ব্রহ্ম—যিনি আমাদের দেহ, চরিত্র, সুখ দুঃখের কোন খবরই রাখেন না। কিন্তু যে-কাল মানুষের কাছে ধরা দিয়েছে সে আর তেমন নির্লিপ্ত থাকিতে পারে না। মানুষের সংস্পর্শে প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার বিকৃতি

ঘটিতেছে। আমাদের হাস্যে সে হাসে, আমাদের কান্নায় সে কাঁদে, আমাদের চিন্তায় সে ভারিক্কে হয়, আমাদের চাঞ্চল্যে সে লাফায়। আর আমাদের এই কর্ম্মকোলাহলকে সে একটু প্রতিধ্বনির মত ভেঙচাইয়া সরিয়া পড়িতে পারে না, সব ব্যাপারগুলো অচ্ছেদ্য ভাবে তাহার সঙ্গে গাঁথিয়া যায়। শুধু মানুষেরই নয়, প্রকৃতিরও সব ব্যাপার ক্রমান্বয়ে এই কালের কুক্ষিগত হইতেছে। ফুলের হাসি, বা পাখীর গান, আর অগ্নুৎপাত বা সাগর-গর্জ্জন, মধুর ভীষণ কোন ব্যাপারই বাদ পড়ে না। তবে মানুষের মনের সঙ্গে যে-গুলোর কোন দিনই কোন সংযোগ ঘটে না, সে-গুলোর থাকা না থাকায় আমাদের কি আসিয়া যায়?

ফল কথা, প্রকৃতিরই হোক আর মানুষেরই হোক, যে সব ক্রিয়া-কলাপ মানুষের মনের সঙ্গে সম্পর্কিত সেই সবই কেবল মানুষের মনুষ্যত্বের নিয়ামক। আর এই গুলোকেই আমাদের পরিমিত কালের আত্মা বলা যাইতে পারে। মানুষ যে দিন এই ভবে দেখা দিয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহার সম্পর্কিত কালটা আর ফাঁকা নাই। তাহার ভিতরটা সেই দিন হইতেই মানুষের ছোট বড় প্রাকৃতিক অপ্রাকৃতিক সব রকম জ্ঞানের বোঝায় ভরাট হইয়া আসিতেছে। আর এই বোঝা সমেত এই কালটা, যে শক্তি বহন করিতেছে সেই হইল স্মৃতি। এমন ভাবে দেখিলে স্মৃতিকেই যেন সর্ব্বেসর্ব্বা, আর মনের অপর শক্তি-গুলোকে যেন নিতান্ত ইহারই পোঁ-ধরা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা বাস্তবিক কি তাহাই? স্মৃতি না থাকিলে যেমন অপর শক্তি অকেজো হইয়া যাইতে পারে, সেইরূপ আবার অপর শক্তির অভাবে স্মৃতির কাজেরই বা মূল্য কি, আর তাহার ভাণ্ডারটাই বা পোরে কিসে?

ভাণ্ডারী বলিয়াই না তাহার যাহা কিছু আদর; কিন্তু এই ভাণ্ডার যদি খালি পড়িয়া থাকে কিংবা কতকগুলো অকেজো জিনিষের আস্তানা হয়, তবে এমন ভাণ্ডারী না থাকিলেই ক্ষতি কি? মনের গ্রহণশক্তি এই ভাণ্ডারের প্রথম ন্যাস সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনের সংস্পর্শে মন ভাব সংগ্রহ করিয়া স্মৃতির ভাণ্ডারে ন্যস্ত রাখে। এই ন্যস্ত ভার বিচারশক্তির সহিত সংযুক্ত হইলে তবে তাহা কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠে, নতুবা তাহা চিরদিন অকেজো ভারের মতই থাকে। ক্রমে এই ক্ষুদ্র ভাব অনুভূতি পরম্পরা নানা শক্তির প্রক্রিয়ায় নানা রকমে বিভক্ত, বিন্যস্ত ও বিবর্দ্ধিত হইয়া যে কত বিচিত্র ও বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিতে পরে, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? অবশ্যই মর্ত্তজ্ঞানের এই হিসাবে মানুষের দৈবজ্ঞানেরও বাদ পড়িবার কোন কথা নাই।

তাই আমরা যে ভূতের বোঝার কথা তুলিয়াছি, সেটা বড় সামান্য নয়, সেটা ওই বিচিত্র ও বিরাটেরই সমষ্টি। যাহা বিচিত্র অবশ্য তাহাকেই বিরাট বলিতেছি না। বৈচিত্র্যের মধ্যে বিরাটও আছে, ক্ষুদ্রও আছে। এখন এই ভূতের বোঝাটাকে আমাদের মনুষ্যত্বের সমষ্টি বলিতে অথবা সমষ্টিগত মনুষ্যত্ব বলিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি নাই। ভূত বলিতে আমরা মানবের উৎপত্তি হইতে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমস্ত কালটাকে ধরিয়াছি। অবশ্য অতি সূক্ষ্ম ভাবে দেখিলে ভূত ও বর্ত্তমানের মধ্যে পার্থক্যের দাঁড়ি টানা বড়ই শক্ত। কারণ পার্থক্যের ভাবটা মনে আসিতে না আসিতেই বর্ত্তমানটা ভূত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এত চুলচেরা হিসাবে আমাদের প্রয়োজন নাই, এই পার্থক্যটাকে যে মুহূর্ত্তে ধারণা করিতে পারি, তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত-টাকে ভূত হিসাবে ধরিলে আমাদের মনুষ্যত্বের পরিমাণের চিন্তায় তেমন

একটা ভুল হয় না। অনন্ত না হইলেও এই অপরিমেয় ভূতটার মধ্যেই মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্ব অর্থাৎ মানুষ নিজের শক্তির চালনায় যাহা কিছু লাভ করিয়াছে সমস্ত নিহিত আছে, এ কথায় কি দোষ ঘটিতে পারে?

কেহ হয়ত বলিবেন, মানুষ ত নিজের শক্তিতে পুঁথি-পত্র, ধন-দৌলৎ, ঘর-বাড়ী, কল কারখানা সবই লাভ করিয়াছে, এ গুলোও কি মনুষ্যত্ব? পুঁথি-পত্র অবশ্যই মনুষ্যত্ব নয়, সে ত কাগজ আর কালি, কিন্তু তাহার মধ্যে মানুষের যে সব সাধনা ও সিদ্ধি সঞ্চিত আছে, সেগুলো অবশ্যই মনুষ্যত্ব। ধন-দৌলৎও মনুষ্যত্ব নয়, তাহা ত হয় ধাতু, নয় মাটি, নয় অন্য কিছু; কিন্তু তাহার অর্জ্জনে, সংরক্ষণে, বর্দ্ধনে বা ব্যয়ে যে জ্ঞান মানুষের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সেটা অবশ্যই মনুষ্যত্ব। সেইরূপ পুরাতন তাজমহল বা নূতন এঞ্জিনও মনুষ্যত্ব নয়, সেগুলো অবশ্যই ইট, কাঠ, লোহা, লক্কড়, আগুন, জল ইত্যাদি; কিন্তু তাহাদের রচনায় বা চালনায় মানুষ যে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে, সেটা অবশ্যই মনুষ্যত্ব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যাহাকে আমরা সাধারণ কথায় জড় বলি, সে আমাদের মনুষ্যত্বের উপাদান ঠিক যোগায় না, কিন্তু এই জড় নানা রকমে আমাদের মনে যে সব অনুভূতি জন্মায়, সেইগুলোকে হজম করিবার মানসী শক্তির উপরেই অর্থাৎ সেইগুলোকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রেরণায় বিশেষ বিশেষ ভাবে অধিকৃত, আয়ত্ত ও বিন্যস্ত করিবার জ্ঞান ও প্রক্রিয়ার উপরেই আমাদের মনুষ্যত্ব কতক অংশে অধিষ্ঠিত। এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন।

এতক্ষণ এ বোঝাটার উদ্ভব ও আয়তনের কথাই কতক ভাবিয়াছি,

এক্ষণে ইহার বিশেষত্ব একটু পরখ করিয়া দেখা যাক। সমষ্টি ভাবে ধরিলে, এটা যে এই বর্ত্তমানের মধ্যেই খুব বিশাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা অবশ্য সকলেই মানিবেন। এ নাগাদ সমগ্র মানবজাতি নানা ভাবে নানা সাধনার মধ্য দিয়া যে সব জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে, তাহার হিসাব নিকাশ করা বড় সোজা ব্যাপার নয়। এই জ্ঞান সমষ্টির বিশালতাই যে ইহার হিসাবটা এত শক্ত করিয়া তুলিয়াছে, শুধু তাহাই নয়। এই সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টি জ্ঞানের তেমন ঘনিষ্ট যোগ নাই, এটাও ইহার পরিমেয়তার একটা অন্তরায়। সমগ্র মানব জাতির লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে যদি প্রত্যেক মানবের তেমন যোগ থাকিত, তবে তাহা বিশাল হইলেও তাহার অন্ততঃ একটা মোটামুটি হিসাব খাড়া করা, মানুষের পক্ষে তত শক্ত হইত না। কিন্তু এই সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির সংযোগের পথে অনেক বিঘ্ন ঘটিয়াছে। সমগ্র মানব যদি একই প্রেরণায় একই দিকে চলিত, তবে এই সমষ্টিতে ব্যষ্টিতে এতটা বিচ্ছেদ ঘটিত না। বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সমগ্র জাতি ক্রমে বিশেষ বিশেষ জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক বিশিষ্ট জাতিই তাহার নিজের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইবার চেষ্টায় বিভিন্ন সাধনা অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন সিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

তাই ব্যষ্টির সঙ্গে এই বিশেষ সমষ্টির যোগ যতটা ঘনিষ্ঠ, সমগ্র সমষ্টির সঙ্গে ততটা নয়। মুখ্যরূপে এই বিশেষের প্রভাবেই ব্যষ্টির মনুষ্যত্বের বিকাশ। সমগ্র বোঝাটার এই বিশেষ অংশগুলি অবশ্যই সব সমান নয়। কেবল যে আকারে তাহারা অসমান, তাহাই নয়। কিন্তু যে সব জিনিষে তাহারা ভরিয়া উঠিয়াছে, সে গুলোর

ওজনের ও বৈচিত্র্যের অনেক তারতম্য আছে। তবে প্রত্যেকের এই পরিমাণ বা বৈচিত্র্যগত পার্থক্য অবশ্য সকল সময়েই সমান থাকিতে পারে না। এই জাতীয় মনুষ্যত্বগুলি কতকটা নিজ নিজ প্রতিভাবলে, কতকটা অপরের সহিত আদানপ্রদানে, কালে কালে কিছু না কিছু বিবর্দ্ধিত বা রূপান্তরিত হইয়া আসিতেছে। এই আদানপ্রদানের পথ বর্ত্তমানে একটু প্রশস্ত হইয়া পড়ায়, এই বিবর্দ্ধন বা রূপান্তরের কাজটাও একটু তোড়ে চলিয়াছে। ভবিষ্যতে যখন এই বিশেষ মনুষ্যত্বগুলি পরস্পরকে সম্যক-রূপে বুঝিতে ও আত্মস্থ করিতে পারিবে, তখনই এক সার্ব্বভৌমিক আদর্শের সম্ভাবনা। আর এই আদর্শের প্রভাবে তখন যে সমগ্রের সঙ্গে ব্যষ্টির যোগটা আরও গাঢ় হইয়া যাইতে পারে, এটাও নিশ্চয়ই অনুমান যোগ্য।

কিন্তু এ সার্ব্বভৌমিক আদর্শই বল, আর যাহাতেই বল, কিছুতেই এক একটি বোঝার বৈশিষ্ট্য একেবারে ঘুচিবার নয়। এই বৈশিষ্টের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটু মতভেদ আছে। কেবল পারিপার্শ্বিকের প্রভাবেই এই বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হইয়াছে, এটা বোধ হয় কেহ কেহ মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন আদি হইতেই জাতিতে জাতিতে একটা স্বাভাবিক মজ্জাগত স্বাতন্ত্র্য চলিয়া আসিতেছে। এই আদি শব্দটার ভিতরে সম্ভবত কোন প্রকার অভিব্যক্তিবাদের নিদর্শন নাই। আর এই মজ্জাগত স্বাতন্ত্র্যের কারণ জানিতে চাহিলে তাঁহারা বিধাতার খেয়াল ছাড়া আর কোন কিছুর নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। এখন বিধাতার এই খেয়াল লইয়া মানুষ অনেক খেয়াল দেখিতে পারে, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের প্রভাবটা একেবারে তর্কাতীত। এটাকে মানুষ চিরদিনই অনুভব করিয়া আসিয়াছে, এখনও করিতেছে।

আর ভবিষ্যতে এই বিশেষ পারিপার্শ্বিকগুলো যে কখনই একেবারে এক হইয়া যাইবে না, ইহাও কতক নিশ্চিত। তাই মজ্জাগত স্বাতন্ত্র্যের কথাটাকে ওড়ান যায়, কিন্তু প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের প্রভাবটাকে কিছুতেই এড়ান যায় না।

তবে এই প্রকৃতির গড়া পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানুষের নিজ হাতে-গড়া একটা পারিপার্শ্বিক ত খাড়া হইয়াছে। আর এই মানবীয় পারি-পার্শ্বিকের বৈশিষ্ট্য যে শুধুই প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের স্বাতন্ত্র্যেরদ্বারাই নিয়মিত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই ঠিক কথা নয়। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মজ্জাগত স্বাতন্ত্র্যের কথা ধরি বা না ধরি, কিন্তু মানবের ইচ্ছাগত স্বাতন্ত্র্য যে, এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে আরও বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? প্রত্যেক জাতির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য অবশ্য কেবল তাহার প্রকৃতিক পারিপার্শ্বিকের বৈশিষ্ট্যেরই অনিবার্য্য ফল নয়। কতক নিজের ইচ্ছাকৃত স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিতে আর কতক অপর জাতির শক্তিকৃত প্রভাবে, এই জাতীয় মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই অনেক প্রকট হইয়া পড়ে। কোনও জাতির প্রাকৃতিক পারি-পার্শ্বিক যেরূপ অপরিবর্ত্তনীয় তাহার রাষ্ট্র বা সমাজগত পারি-পার্শ্বিক অবশ্যই সেরূপ নয়। মানুষ পাহাড় পর্ব্বত সরাইয়া নদী সাগর ভরাইয়া প্রকৃতির এই অঙ্গটাকে বড় একটা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, সূর্য্যের উত্তাপকেও সকল জায়গায় সমানভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া তাহার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব; কিন্তু তাহার রাষ্ট্র ও সমাজগত পরিবর্ত্তন অসম্ভব ত নয়ই বরং কতকটা যেন অবশ্যম্ভাবী।

এখন আমরা এই মনুষ্যত্বের সমষ্টি ওরফে ভূতের বোঝার মধ্যে

দুইটি প্রভাব বা ভার লক্ষ্য করিলাম। প্রথম সমগ্রের প্রভাব, দ্বিতীয় ইহার বিশেষ বিশেষ অংশের প্রভাব। ইহা ছাড়া এই প্রভাব বা ভার দুইটির ক্রিয়া যাহার উপর লক্ষিত হয়, তাহার নিজেরও একটা প্রভাব আছে। অর্থাৎ যে ব্যষ্টি মনকে সমগ্র বা বিশিষ্ট মনুষ্যত্বে চালিত করে, সেও উল্টাইয়া ইহাদের উপর কতকটা কর্তৃত্ব করিতে ছাড়ে না। সমগ্র বা বিশিষ্টের তুলনায় ব্যষ্টি মনুষ্যত্বের কালগত বা পরিমাণগত আয়তন যে খুবই ছোট ইহা ত একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। অংশ যে সমষ্টির চেয়ে ছোট এটা আর তর্ক করিয়া বুঝিবার বিষয় নয়। কিন্তু এই ব্যষ্টি-মনুষ্যত্ব সর্ব্বপ্রকারে ছোট হইলেও ইহার প্রভাব সেরূপ সামান্য নয়। আমাদের দেহরূপ পঞ্চভূতের বোঝার মধ্যে আমাদের মস্তিষ্কটা অতিক্ষুদ্র হইলেও, একটুও নগণ্য নয়। তেমনিই এই সমগ্র মনুষ্যত্বের বোঝার ভিতর ছোট ব্যষ্টি মনের মনুষ্যত্বটা বিশেষরূপই গণনীয় ও মাননীয়। কারণ এইটাই হইল দেহ সম্পর্কে মস্তিষ্কের মত সমগ্র মনুষ্যত্বের একরূপ চৈতন্যকেন্দ্র। সমগ্র বা বিশিষ্টের বয়সের গাছপাথর নাই, ব্যষ্টির আয়ুষ্কাল বড় জোর এক শত বৎসর। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এই শতায়ু ত লক্ষায়ুকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই ব্যষ্টির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিলে, সকল প্রকার সমষ্টিই যে কতকালের বাসি-মড়া হইয়া যাইত। ব্যষ্টির সঙ্গে সংযুক্ত আছে বলিয়াই এই সব সমষ্টি নিত্য নূতন প্রাণে ও নূতন রূপে সঞ্জীবিত ও রূপান্তরিত হইয়া আসিতেছে। তাই এই ব্যষ্টি একদিকে অতিক্ষুদ্র হইলেও অপর দিকে অতি মহান্।

তবে এখন আমরা বিষয়টার উপসংহার করি। এই ভূতের বোঝার আরও বেশী খবর লইতে গেলে বোধ হয় এটাই মাসিক

পত্রের স্কন্ধে একটা ভূতের বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে। যাই হোক, এই খবরটা যতটুক পাওয়া গেল, তাহাতে এই বুঝিলাম, আমাদের মনুষ্যত্বটা এক হিসাবে একটা ভূতের বোঝাই বটে। পঞ্চভূত গৌণ ভাবে এই বোঝাটির উপাদান যোগাইলেও, সেটাকে গড়িয়া তোলে আমাদের মানসিক শক্তিপুঞ্জ। এই শক্তিগুলো একা একা বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের সমবেত সাধনায় যে সব ফল উৎপন্ন হয়, স্মৃতিই সে সব নিজের হেপাজতে রক্ষা করে। আর এই বোঝাটির ভিতরে তিন রকমের প্রভাব বা ভার লক্ষিত হয়। এক সমষ্টিগত, অপর বৈশিষ্ট্যগত আর একটা ব্যষ্টিগত। সমগ্রতার প্রভাব তেমন সুস্পষ্ট নয়, বৈশিষ্ট্যের প্রভাব খুবই স্পষ্ট, আর যাহার উপর এই দুইটা প্রভাব কার্য্য করে, সেই ব্যষ্টি ছোট হইলেও তাহার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বড়ই জীবন্ত ও প্রবল।

এই সঙ্গে আর একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রভাব তিনটির সামঞ্জস্যের উপরেই বোঝাটার ভারকেন্দ্র ঠিক থাকে। ইহাদের মধ্যে কোনটি বেয়াড়া রকম বাড়িয়া উঠিলে, বোঝাটাও এমন বিদঘুটে হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহাকে ঘাড়ে করিয়া মানুষের পথ চলা বড়ই পীড়াদায়ক হইয়া ওঠে। সমগ্রতার একটা বায়বীয় উচ্ছ্বাসে বোঝাটি অনেক সময় লাফাইয়া যেন ব্যোমযানের মত আকাশের দিকে উড়িতে চায়। বৈশিষ্ট্যের অত্যাচারে বোঝাটা এমন জগদ্দল পাথরের মত ভারি হইয়া পড়ে যে, তাহাকে লইয়া মানুষের আর এক পা'ও নড়িবার শক্তি থাকে না, আবার ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায় বোঝাটা এমন চঞ্চল হইয়া ওঠে যে, তাহা হইতে অনেক ভাল জিনিষ দিক বিদিকে

ঠিকরিয়া পড়িতে পারে। আর যখন এই প্রভাব তিনটা যথারূপে ক্রিয়াশীল থাকে, তখন এই ভূতের বোঝাটা মানুষের মাথায় এমন লঘু ও শোভন হইয়া দাঁড়ায়, যেন মনে হয়, আহা, ওটা সত্যই যে রাজার রাজমুকুট !

শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ।

অভিভাষণ। *

——:*:——

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতেদুর্হিতরৌ সংবিদানে।
যেনা সংগচ্ছা উপ মা স শিক্ষাচ্চারু বদানি পিতরঃ সংগতেষু॥
বিদ্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ॥
এষামহং সমাসীনানাং বর্চো বিজ্ঞানমা দদে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদো মামিন্দ্র ভগিনং কৃণু॥
যদ্ বো মনঃ পরাগতং যদ্ বদ্ধমিহ বেহ বা।
তদ্ ব আ বর্ত্তয়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ॥

অথর্ব্ববেদসংহিতা ৭। ১৩। ১-৪

ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মোৎসবের দিনে যাহা আমাদিগের দূর হইতেও সুদূর, তাহা সন্নিকট হয়; যাহা প্রচ্ছন্ন তাহা বিকশিত হয়; যাহা সুষুপ্ত তাহা জাগ্রত হয়। আজকার দিনে সমাসীন সভাসদ্‌বর্গের হৃদয়ের আনন্দ, সকলের হৃদয়কে অধিকার করে। অন্য সময়ে সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় গৌরবের ভাব কিংবা অহঙ্কার যাহা অব্যক্ত থাকে, আজ তাহা পরিস্ফুট হয়। সেই সাম্প্রদায়িক গৌরবের ভাব, আমার মনকে অধিকার করিয়াছে বলিয়াই সাহস পূর্ব্বক আজ আপনাদিগের সম্মুখীন,

* আদিব্রাহ্মসমাজের ঊননবতিতম সাম্বাৎসরিক উৎসবে পঠিত।

সেই সামাজিক গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতে কুণ্ঠা কিংবা সঙ্কোচ হয় না। সমবেত সকল হৃদয়ের প্রসূত আনন্দ আমার নিজের হৃদয়কে আনন্দময় করিয়াছে বলিয়াই সানন্দে অদ্যকার অধিবেশনে আদিসমাজের সভাপতিরূপে সমাজের যাহা উদ্দেশ্য ও নিবেদন, তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনাদের শুভ ইচ্ছা পাই, এই প্রার্থনা। এইরূপ আনন্দ, ভক্তিতে পরিণত হয়, পরম প্রেমরূপের সাধনার সাহায্য করে।

যে সাম্প্রদায়িক ভাবের কথা উল্লেখ করিলাম তাহাই আমাদের জাতীয় ভাবের ভিত্তি, তাহাই আমাদিগের জাতীয়তার স্রষ্টা। সেই সাম্প্রদায়িক ভাব হিন্দুর বলিয়া আমরা নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি। বহুদিন পূর্ব্বে এই সমাজের একজন পূজ্য স্বনামধন্য আচার্য্য মহোদয় * হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি এই কয়েকটী কথা বলেন :—

"আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীর-কুন্তল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব যৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম্ম, সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবী সুশোভিত করিতেছে, হিন্দুজাতির কীর্ত্তি, হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত করিতেছে।"

আমারও সেই আশা ও বিশ্বাস। তাঁহার উপসংহার আমার উদ্বোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলাম। আমি বিশ্বাস করি, আমরা মরি নাই।

* ৺রাজনারায়ণ বসু মহোদয়।

হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুজাতি মরিবার নহে। যাহা সত্য, সত্যপ্রতিষ্ঠ, তাহার মরণ নাই। আশা হয়, আমাদের ধর্ম্মকেন্দ্র জাতীয় ভাব জাগিয়া উঠিলে সেই ভাব সমগ্র পৃথিবীকে অধিকার করিবে, পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। সত্যমেব জয়তে নানৃতং।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—"আমরা ভারতবাসী যে এই দুঃখ দারিদ্র্য, ঘরে বাহিরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, সেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক।" আমারও তাহাই মনে হয়। আমরা যে শক্তি আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছি তাহা ধর্ম্মশক্তি। সে শক্তির বিস্তার নিশ্চয় হইবে। মরাগাঙ্গে আবার জোয়ার বহিবে, আমার বিশ্বাস। আশা হয় পোড়া ক্ষেত আবার অঙ্কুরিত হইবে। সেই আশার উপর নির্ভর করিয়া আজ দু'চার কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি।

ইউরোপে যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, যাহা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, যাহা এখনও ধোঁয়াইতেছে, যতদিন ধর্ম্মাধিকার ও রাষ্ট্রধর্ম্ম স্বতন্ত্র থাকিবে, ততদিন সে আগুন নিভিবে না। ইউরোপীয় জগতে স্বাধিকার ও স্বকর্তৃত্বের ভাব প্রবল। তাহা হইতেই সেখানে তুমুল বিরোধের উৎপত্তি হয়। এই যুদ্ধই তাহার পরিণাম। সেখানে যে আগুন জ্বলিয়াছিল তাহাতে সন্ধিপত্র কাগজের টুকরা মাত্র। League of Nations-ই বল, Parliament of men-ই বল, আর Federation of the world-ই বল—যে ভাবেই তাহার উল্লেখ করনা কেন, সেই League, Federation, Parliament-এর ভিত্তি ধর্ম্ম না হইলে তাহা নামেমাত্রই থাকিবে। সে নামে এস্থলে মুক্তি নাই। মোক্ষ—ধর্ম্মভাবের উপর নির্ভর করে; ঐহিক প্রতিপত্তির

উপর নহে। ঐহিক প্রতিপত্তির উৎপত্তি ও শেষ এইখানে। কর্ম্মী হও, কিন্তু কর্ম্মের শেষে "ব্রহ্মার্পণমস্তু" বলিয়া কর্ম্মের ফল পরব্রহ্মকে অর্পণ না করিলে মুক্তি নাই, শান্তি নাই।

কর্ম্মী কর্ম্মবল চায়। তুমি যতই সেই শক্তি উপার্জ্জন কর তাহা ততই অসংযত হইয়া পড়ে, তাহার উপসংহার কল্যাণময় হয় না; সে শক্তি-সাধনা আসুরিক।

নিট্‌সকের (Nietzsche) অ্যান্টিক্রাইষ্ট গ্রন্থে (Anti Christ) পড়িতে পাই—

"শুভ কিসে?—ক্ষমতা প্রসারে, ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা যাহাতে প্রবল হয় তাহাতে, মানুষের শক্তি প্রতাপে। আনন্দ কিসে?—ক্ষমতা প্রসারের অনুভূতিতে, বাধা বিঘ্নের অতিক্রমে, ক্ষমতা অর্জ্জনে অক্লান্তি ও অপরিতৃপ্তিতে। সর্ব্বস্ব বিনিময়ে শান্তি-লাভে নহে, সংগ্রামে। কর্ম্মবলে, ধর্ম্মবলে নহে।" *

জার্ম্মানীতে তিনি এই শিক্ষা দেন। সে জাতি এই আসুরিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। এখন তাহার অবস্থা কি?

ম্যাটসিনি তাঁহার "মানবধর্ম্মে" (Duties of man) স্পষ্টভাবে ঐহিক প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বলেন, 'যদি ইহাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য

* "What is good? All that increases the feeling of power, will to power, power itself in man. What is happiness? The feeling that power increases, that resistance is overcome. Not contendedness but more power; not peace at any price but warfare, not virtue but capacity."

বলিয়া মানিয়া লও, তবে বিরোধ লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের ফলে প্রেম, প্রীতি, আনন্দ লাভ হয় না'। ঐহিক প্রতিপত্তি যাহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কারে ব্যস্ত। সে পথ ধরিয়া চলিতে কাহার বুকে পা পড়িতেছে তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই; কি দলাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। মুখে "ভাই, ভাই", কিন্তু কার্য্যে বৈরী—ইহাই স্বাধিকারবাদীদিগের শিক্ষার ফল। ম্যাটসিনি বলেন যে, বিরোধ, স্বতন্ত্রভাব, ধর্ম্মবন্ধন না থাকিলে ঘটিবেই ঘটিবে। নির্ব্বিরোধ হইতে চাহিলে সকলের লক্ষ্য এক হওয়া,—একীভূত হওয়া চাই, সেই লক্ষ্য ধর্ম্ম। ব্যক্তিগত অধিকার আছে সত্য, কিন্তু সেই অধিকার রক্ষার চেষ্টাতে স্বভাবতই অন্য জন বা অন্য জাতি প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়—যতদিন তাহাকে ধর্ম্মভাবের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে না পার। সমাজ কিংবা জাতি সংস্করণে ধর্ম্মভাবের প্রয়োজন; আমরা এক পিতার সন্তান—এই বোধ জীবনের মধ্যবিন্দু হওয়া চাই; এই ভাব জীবনের প্রত্যেক অংশে ব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক। তিনি ফরাসী দেশের Lamennais-এর উপদেশের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 'অধিকারলিপ্সা ও কর্ত্তব্যপালন দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ'। প্রাপ্তির চেষ্টাতে ত্যাগের ভাব না থাকিলে জাতিগত বিরোধের অবসান হয় না। স্বাধিকার-চেষ্টায় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে বৈষম্যের সামঞ্জস্য করিতে পারা যায় না, জাতীয় একতা গড়িয়া তুলিতে পারা যায় না। যে জাতি স্বাধিকার-প্রসারে আত্ম-নিবিষ্ট, সে জাতির জীবন শোণিত সিক্ত। এই চেষ্টার নিবৃত্তি কিসে, শেষ কোথায়? যত দিন সেই জাতি অপেক্ষা দুর্ব্বল জাতি জগতে

থাকিবে, তত দিন সেই অধিকারের প্রসার চলিতে থাকিবে। নির্জ্জীব জাতি দলিত হইবে। বলবানের কথা,—'আমার শক্তি আছে, আমি সেই শক্তির উপর নির্ভর করি। আমার পথে যে পড়িবে তাহাকে দমন করিব, যাহার সহিত বিরোধ তাহাকে উচ্ছেদ করিব; সংগ্রামই আমার জীবন। বাধা বিঘ্ন লক্ষ্য করিব না। আমার শক্তির বিস্তার চাই'।

এই আসুরিক ভাব প্রবল হইলে পৃথিবী দানবরাজ্য হয়। যদি পৃথিবীর কোন স্থানে ধর্ম্মরাজ্য থাকে, তবে তাহার সহিত সেই ধর্ম্ম-রাজ্যের সংগ্রাম বাধে, তাহাতেই দেব-দানবের যুদ্ধ হয়। যে মহা-সমর হইয়া গেল, তাহার শেষ অঙ্কে এই ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়াছিল বলিয়া আসুরিক বলের দমন হইয়াছে। এই যুদ্ধে আমেরিকার যোগদান সেই ধর্ম্মভাবের উত্তেজনায়। আমেরিকার নিজের সুবিধা কিংবা প্রতিপত্তিলাভের কিছুই ছিল না। Crusade-এর সময় যেমন God wills it! God wills it! বলিয়া বিবিধ জাতি একত্রিত হইয়াছিল, আমেরিকাও সেই ধর্ম্মভাব লইয়া এই মহাযুদ্ধে যোগদান করে। ইহাই দেবদানবের যুদ্ধ। ব্রহ্মশক্তির অভাবে রিপু দমন হয় না। যে শক্তিসাধনায় মুক্তি লাভ হয়, তাহা ঐশী শক্তি—তাহা ঐহিক প্রতিপত্তি নহে। ঐশী শক্তিই প্রাণশক্তি। সেই শক্তির সাধনাতেই মানবের মোক্ষ লাভ হয়। যাহা কিছু কর্ম্ম তাহাই ব্রহ্মে অর্পণ করিলে শান্তি। অশান্ত বিক্ষিপ্ত হৃদয়, রিপু-উত্তেজিত জীবন, ধ্বংসের কারণ, প্রলয়ের কারণ। ধর্ম্মই কর্ত্তব্য। প্রাপ্তিতে ত্যাগের ভাব চাই। আমার যাহা, তাহা আমারই নহে, আমাদের সবাকার। আমি কয়দিনের? যাহা আমার, তাহার শেষ আমাতেই। যাহা

সবাকার, তাহার শেষ নাই; সবটা শেষ হইবার নহে। সেই "আমিত্ব" পরিত্যাগ আবশ্যক। সব জগতের যাহা, তাহা অনন্তের; হৃদয়ের সেই সর্ব্বব্যাপক ভাব ধর্ম্মেই অর্জ্জনীয়। একমাত্র কর্ম্মবলের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র আসুরিক শক্তির উপর নির্ভর করে। তাহা মরণশীল।

Mazzini বলেন—"যদি মানব-মনের অধীশ্বররূপে একটি মহা মন না থাকেন, তবে বলবত্তর ব্যক্তিরা আমাদের উপর অত্যাচার করিলে কে সেই অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? মানুষের রচিত নহে, এমন কোন পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য নিয়ম যদি না থাকে, তবে ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার মাপদণ্ড কোথায় থাকে? অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অনিয়মের বিরুদ্ধে, কাহার বলে, কিসের বলে প্রতিবাদ করিব? আমাদের ব্যক্তিগত মতামতের দোহাই দিয়া জন-সাধারণকে কি প্রকারে স্বার্থত্যাগ করিতে, আপনাকে বলি দিতে আহ্বান করিব? যতদিন পর্য্যন্ত আমরা আপনাদের বুদ্ধি-প্রসূত মতামতের উপর দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতে থাকিব, ততদিন কথায় মিল পাইতে পারি, কিন্তু কাজে পাইতে পারিব না। *

* "If there be not a Supreme mind reigning over all human minds who can save us from the tyranny of our fellow-men, whenever they find themselves stronger than we. If there be not a holy and inviolable law, not created by man, what rule have we to judge whether an act is just or unjust? In the name of whom, in the name of what shall we protest against oppression and irregularity? How shall we demand

জর্ম্মান জাতি শক্তিকেই মানবজাতির প্রধান সাধন বলিয়া তাহাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী সেই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন। সংগ্রামেচ্ছা মানব প্রকৃতিগত, অতএব সংগ্রামচেষ্টা, সংগ্রাম করিতে শিক্ষা মানবজীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা (Baron von Freytag Loringhoven) জর্ম্মানীর একজন সর্ব্বপ্রধান সৈনিক লেখকের মত।

ট্রাইট্‌স্‌কে (Treitschke) বলেন—

"সুসভ্য বল, বর্ব্বর বল উভয়েরই পশুপ্রবৃত্তি আছে। বাইবেলের এ কথা সত্য—মানবচিত্রের পাপভাব মানুষ যে সময় সৃষ্টি হয় সেই সময় হইতেই। সভ্যতা সে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে অপারক—যতই কেন সভ্য হও না তাহা যাইবার নহে। পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে মানুষ কখনই পারিবে না"। *

কিন্তু তাঁহারও মতে মানবজাতির আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন না হইলে শক্তিপূজাতে মানবের হিতসাধন হইবে না। আত্মার সংস্কার যদি

of men self-sacrifice, martyrdom in the name of our individual opinions? As long as we speak as individuals in the name of whatever theory our individual intellect suggests to us, we shall have what we have to-day adherence in words not in deeds.

* The polished man of the world and the savage have both the brute in them. Nothing is truer than the biblical doctrine of original sin, which is not to be uprooted by civilisation to whatever point you may bring it.

আবশ্যক হয়, তাহা ধর্ম্মভাব ভিন্ন কিসে হইবে? জার্ম্মানসম্রাট যিশুখৃষ্টের পদ পাইয়াছেন ভাবিতেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে তাঁহার প্রজাবর্গকে বলেন "আমি সমরেশ—আমি তোমাদের রণদেবতা। আমি যদি তোমাদিগকে আজ্ঞা করি, পিতা মাতাকে সংহার কর, তোমাদিগের তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করিতে হইবে। সে কার্য্য ভাল কি মন্দ, বিচার করিবে না। তোমাদের শক্তিতে আমার রাজশক্তি, কিন্তু আমার উপরে আর কেহ নাই। আমার আজ্ঞাপালনই তোমাদের প্রধান ধর্ম্ম"।

জার্ম্মানির নেতাগণ জার্ম্মান সৈনিককে এই ভাবে শিক্ষা দেন যে, তাহারা সততই মরিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। শিক্ষা দেন, "বল, আমরা কোথায় গিয়া প্রাণ দিব? আমরা বলিবামাত্র প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিবে"। তাঁহাদের মত এই যে, রাজা রাজ্যের জন্য। রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্ম শাসনতন্ত্র (State and Church) বহুদিন হইতেই ইউরোপে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে রাষ্ট্রনীতিকে ধর্ম্মনীতি হইতে স্বতন্ত্র রাখাই কর্ত্তব্য। রাজনীতি ধর্ম্মের শাসনের অধীন নহে, এই তাঁহাদিগের কথা।

কিন্তু হিন্দুর সাধনাতে পরব্রহ্ম লক্ষ্য। ব্রহ্মই আমাদের নেতা ও নিয়ন্তা। পৃথিবীতে যখন ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়াছে, তখনই মানবহৃদয়ে আনন্দ দেখা গিয়াছে। Mazzini এই কথা ইতালীতে প্রচার করেন। তিনি বলেন—"সমস্ত বড় বিপ্লবের ভিতর যে ধ্বনি বাহির হইয়াছিল, তাহাই ক্রুজেডের ধ্বনি—"ঈশ্বর সহায় আছেন, ঈশ্বর সহায় আছেন।" এই ধ্বনিই নিষ্কর্ম্মাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে। স্মরণ রেখো যে য়ুরোপের শিল্পীগণ মেডিচিদিগের অধীনে নিজেদের জনতন্ত্রীয় স্বাধীনতা

বলি দিতে অস্বীকার করিয়া যিশুখৃষ্টকেই জনতন্ত্র রাজ্যের নেতা বলিয়া অভিষেক করেন। *

ইতালিতেই স্যাভনরোলা (Savanorola), ম্যাটসিনি (Mazzini) এবং গ্যারিবল্ডি (Garibaldi) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের শিক্ষা —"জ্ঞানময় পিতা পরব্রহ্মের উপর বিশ্বাস রাখিয়া জ্ঞান অর্জ্জন কর, এবং তাঁহার নিয়ম, সত্যের নিয়ম জান"। আর আমাদের পুরাতন ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন—

"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম"

তাঁহাকে ভক্তি করা সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন ;—

সা তস্মিন্ পরম-প্রেমরূপা

তাঁহাকে "প্রেমস্বরূপম্" বলিয়াছেন—তাঁহাকে লাভ করিলে,—

'সিদ্ধো ভবতি'

অমৃতো ভবতি

তৃপ্তো ভবতি' বলিয়াছেন।

ভন মল্টকে (Von Moltke) একটী শান্তি সঙ্গতে (Peace Deputation) এই কথা বলেন—

"যুদ্ধ পুণ্য কার্য্য, বিধাতার বিধান। এই পুণ্য বিধানে জগতের

* The cry which rang out in all the great revolutions the cry of the crusade "God wills it"! God wills it!" alone can rouse the inert into action. Remember the Florentine artisans who refused to submit their democratic liberty to the domination of the Medicis by solemn vote, elected Christ as head of the republic.

শাসন চলিতেছে। যুদ্ধ মানব-প্রকৃতির মহত্ত্ব ও উন্নতির উপায়। তাহাতেই মনুষ্যত্ব, নিঃস্বার্থপরতা, সাহস, বদান্যতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় পাওয়া যায় ; এক কথায়, অত্যন্ত নীচ, হেয়, বৈষয়িক ভাব হইতে যুদ্ধ মানুষকে উদ্ধার করে।" *

এই কপট আধ্যাত্মিক ভাবের কথা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। জার্ম্মানীর অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিলেই ইহা সত্য কি মিথ্যা বুঝা যায়। যে যাহাই বলুক, ইহা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই ধর্ম্মসভায় উপস্থিত সকলেই নিশ্চয় বলিবেন, ইহা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। পাপকে পুণ্য করিয়া তুলিতে কেহ কখনও পারিবে না। কর্ম্মকে ধর্ম্ম করিয়া তুলিলে অধঃপতন নিশ্চয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অষ্ট্রিয়ার একজন বিখ্যাত অধ্যাপক বলেন, "মানব-সম্প্রদায়ের বিবেক নাই" ("Human communities have no conscience") তিনি বলেন "উদ্দেশ্য সাধনে সব পন্থাই সাধু"। সেখানকার একজন নীতিবৈজ্ঞানিক বলেন, রাজনীতিক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ অনিবার্য্য। জেনারল বার্ণহার্ডি বলেন, যুদ্ধ স্বভাবদত্ত জৈবিক প্রয়োজন (biological necessity); যুদ্ধ হইতে জীবন লাভ হয়। আজকালকার অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মনির এই ভাব। কিন্তু সেই জার্ম্মানিতেই ক্যাণ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা এই যে, "মানুষ স্বাধীন ; স্বাবলম্বন

* "War is sacred and instituted by God ; it is one of the holy bonds which rule the world ; war maintains in man all the great and noble feelings, sense of honour, unselfishness, magnanimity, courage, in short, it prevents man from sinking into the most repulsive materialism."

তাহার প্রকৃতি। যখন সে কোন স্বার্থের দ্বারা বাধ্য না হইয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণ হয়, তখনই সে ন্যায়ের পথে চলে"। তিনি বলেন যে "ঐশী প্রকৃতির পূর্ণ সাগর হইতে অভিব্যক্ত অন্তর্নিহিত এক পবিত্র উৎস হইতে মানুষ নিজের শক্তি লাভ করে। তাই মানুষ কর্ত্তা, নিজের ভিতরে নিজের ইচ্ছা পরিচালনের নিয়ম ধারণ করে।"* Kant আরও বলেন, "মানব-হৃদয়ে ন্যায়-জ্ঞানই ধর্ম্মীভূত। যাহা ন্যায় তাহা পবিত্র, এই নীতি ধর্ম্ম রাজারও হাঁটু পাতিয়া লইতে হয়, কিন্তু Bernhardi বলেন, "ঈশ্বরের প্রেম সর্ব্বোচ্চ সাধনা এবং প্রতিবাসীকে আত্মবৎ দেখ", এই দুই কথা রাজ্যতন্ত্রে খাটে না। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মনীতি নিজের জন্য, তাহা কখনও শাসন তন্ত্রের জন্য হইতে পারে না। যিশুর শিক্ষা স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে।"

Bernhardi হউন, মল্কি (Moltke) হউন কিংবা কাইজারই (Kaiser) হউন, কাহারও কথা আমাদের মনে স্থান পাইবে না। আমরা দাস জাতি; কিন্তু আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব আছে, আমাদের অন্তর্নিহিত বিপুল ধর্ম্মশক্তি আছে। আমাদের মনে এ কথা কখনও স্থান পাইবে না।

আমাদের কথা—

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম; শান্তং শিবমদ্বৈতং

"তদেব সাধ্যতাম্, তদেব সাধ্যতাং"

* He derives his power from an inward spring, a sacred source from the ultimate deeps of the Divine nature. Man is thed a sovereign entity, bearing within himself the law of his own will.

তাঁহাকেই সাধনা কর, তাঁহাকেই সাধনা কর। তিনি আমাদের পিতা, 'পিতানোঽসি' তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান দান করুন—"পিতা নো বোধি"।

অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ—ভক্তদিগেরই তিনি সুলভ।

"নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ

তাঁহাদিগের মধ্যে জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন ক্রিয়াদির ভেদ নাই।

তন্ময়া

তাঁহাতে সকলেই সম্পূর্ণ;

যত স্তদীয়া

সবই তাঁহার;

এই সহজ শিক্ষা হিন্দুধর্ম্মের। যিনি এই শিক্ষা অনুসরণ করেন,

স শ্রেষ্ঠং লভতে, স শ্রেষ্ঠং লভতে

তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠকে প্রাপ্ত হয়েন।

আদিসমাজের এই সাধনা ও শিক্ষা। হিন্দুধর্ম্মের এই বীজ-মন্ত্র-জালই আদিসমাজের বীজমন্ত্র। আদিসমাজ হিন্দুর সমাজ; আদি-সমাজের ধর্ম্ম হিন্দুর ধর্ম্ম। হিন্দুর সাধনাতে জাতি-বিদ্যা-রূপ-কুল-ধন-ক্রিয়াদির ভেদ নাই। সকল হিন্দুকেই, সমগ্র মানব জাতিকে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে বলিতে কুণ্ঠা হয় না—'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং" বলিতে সাহস হয়, বলিতে গৌরবান্বিত মনে হয়। সাধকসমবায় ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আমাদের জাতীয় সমীকরণ

ইহাতেই সম্ভব। উপস্থিত ভূত-ভবিষ্যতের এই শেষ শিক্ষা—ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

"ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী"—

স্বরাধিকার অর্জ্জন কর কিন্তু ধর্ম্মার্জ্জনের অনুশীলন না করিলে, ব্রহ্মে তাহা সমর্পণ না করিলে বিরোধের সামঞ্জস্য সম্ভব নহে। দেশ কাল পাত্রের উপর এ শিক্ষা নির্ভর করে না। সব শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা স্বাবলম্বন। এই শিক্ষা নিজের উপর নির্ভর করে; ইহার জন্য মধ্যবর্ত্তী কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। ইহার মধ্যবিন্দু "ত্বং অস্মাকং তবাস্মি"। এই ধর্ম্ম সনাতন—ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষা নহে।

ম্যাট্‌সিনি বলেন—"ভগবান ক্রমান্বয়ে মানবের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পান। (God manifests Himself successively in humanity).

হিন্দুধর্ম্মেও জগতের হিতের জন্য—

"সম্ভবামি যুগে যুগে"—

ভগবানোক্তি বলিয়া উল্লিখিত।

ম্যাট্‌সিনি ইতালি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আমাদের জাতির ভিতরে ধর্ম্মভাব নিদ্রিত আছে, জাগ্রত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রাশি রাশি রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রচার অপেক্ষা যিনি সেই সুপ্ত ধর্ম্ম-ভাবকে জাগ্রত করিতে পারিবেন, তিনিই জাতির অধিকতর উপকার সাধন করিবেন। *

* The religious sentiment sleeps in our people waiting to be awakened. He who knows how to raise it, will do more for the nation than can be done by twenty political theories.

আমারও আজ সেই কথা। এই কোটি কোটি হিন্দুর মধ্যে এরকম একটি লোকও জন্মে নাই, কি জন্মিবে না ইহা বিশ্বাস করি না। আজ এই ধর্ম্মসভা হইতে ধর্ম্মোৎসবের দিনে সেই ভাব জাগ্রত হয়, এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

খাঁটি বাঙালী।

—:০:—

বাঙলা-সাহিত্যের দারিদ্র্য স্মরণ করে' অবনত-মস্তক হন না, বাঙলা-সাহিত্যের এমন সমালোচক আমাদের দেশে বিরল। বাঙলা-ভাষায় বিশ্ব-সমস্যাঘটিত নাট্য বা উপন্যাস একেবারেই দেখা দেয় নাই, এ আক্ষেপ সমালোচক মাত্রেই করে থাকেন; এবং বিশ্ব-সমস্যার তাঁরা যে তালিকা দেন, তাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, মিথুন-তাত্ত্বিক প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যার উল্লেখ দেখতে পাই। ৺ অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয় দুঃখ করতেন যে, ম্যালেরিয়া-সমস্যা বাঙালী-সাহিত্যিকদের মোটেই বিচলিত করে নাই। কথাটা শুনে আমরা হাসতুম, কিন্তু আজকালকার সমালোচকেরা যখন চার পাতার গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধে বাল্মীকি, হোমার, শেলি, কীট্‌স্, হ্যুগো, গেটে, কালিদাস, চৈতন্যচরিতামৃত, Sturm und Drung, সত্য-শিব-সুন্দর, প্রাচীন ঋষি এবং আধুনিক অর্থনীতিজ্ঞ, এবং অবশেষে হিতোপদেশ ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নাম করে বলেন—economical or commercial problem নিয়ে আমাদের সাহিত্যে কেন কাব্য নেই,—তখন আমরা অবশ্য লজ্জায় অধোবদন হই। কিন্তু commercial problem নিয়ে যদি সাহিত্য রচনা হ'তে পারে, তবে Agricultural problem কি দোষ করলে, যথা—"দেশে ধানের আবাদই প্রশস্ত, না পাটের চাষই প্রশস্ত, আর যদি ধানের আবাদই প্রশস্ত মনে কর, তবে পাট চাষ করে

কৃষকেরা যে টাকা পায়, তা না পাওয়াতে তাদের অবস্থা কি হবে, আর যদি"——থাক্, সমস্যাটা এমনিই এতটা গভীর হয়ে উঠল যে, বার্ণার্ড-শাহী-গোছের একটা মুখবন্ধ জুড়ে না দিলে, এ বিষয়ের মীমাংসা দূরে থাক, সমস্যাটাই পরিষ্কার হবে না। আমাদের দেশে সমস্যার অভাব নেই, এবং সমস্যা নিয়ে ছোট কবিতা বল, মহাকাব্য বল, লিখতে পারেন এমন গুণী লোকেরও অভাব নেই। আমার স্থির বিশ্বাস, পৃথ্বীরাজ-মহাকাব্য-রচয়িতা ইচ্ছা করলেই, যে-কোন বিষয়ে মহাকাব্য লিখতে পারেন। আরও অনেক লোকের নাম করা যেতে পারে, কিন্তু লেখকদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই।

(২)

বিশ্ব-সমস্যার বিশ্লেষণ বা পরিণাম আমাদের সাহিত্যে না থাক—আমাদের এই বাঙলা দেশের ভাব ও চিন্তা, আমাদের আশা ও উৎসাহ বাঙলা-সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে, এমন একটা অন্ধবিশ্বাস পোষণ করে' আমরা নিশ্চিন্ত ছিলুম।

কিন্তু এই সব সমালোচকদের ঠেলায় আমাদের মনে কোনপ্রকার অন্ধতা পুষে রাখা দুষ্কর হ'য়ে উঠেছে। তাঁরা বলছেন, এতকাল ধরে বাঙলা-ভাষায় যে সকল কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লেখা হয়েছে, তাতে খাঁটি বাঙালীর মনের কোনই পরিচয় নেই। অতএব দাঁড়াল এই যে, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য, না বিশ্বসমস্যার আলোচনা করে, না বাঙালীর ভাব ও চিন্তা প্রকাশ করে; অর্থাৎ এর পেছনে না-আছে একটা জাতির আত্মা, না-আছে সমগ্র বিশ্বমানবের মন। এ কেবল জনকতক

ইংরাজী-নবীশ ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন লোকের,—যাদের বাঙলা কাগজে বাবু-সম্প্রদায় বলে গালাগালি দেয়,—তাদের সাহিত্য ; মুদিবাখালি প্রভৃতি খাঁটি বাঙালী,—যারা বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, মনসার-গান, মত্তিরায়ের 'অজামিলের হরিপাদপদ্ম লাভ' প্রভৃতি খাঁটি বাঙলা-সাহিত্যে মুগ্ধ,—তারা ভুলেও নব্যবঙ্গ-সাহিত্য পড়ে না।

(৩)

বিজ্ঞ সমালোচক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেন—"কালিদাসের কুমার-সম্ভব, মুকুন্দরামের চণ্ডী, চৈতন্যভাগবত অথবা বৈষ্ণব পদাবলী লোকে দৈনিক জীবনে সাধনার অঙ্গরূপে নিত্য পাঠ করিয়া থাকে। কলেজের শেক্সপীয়র অথবা গেয়েটে বা রবিবাবুর কাব্য-সাহিত্যের পাঠের মত নহে"।—বাস্তববাদীদের নেতাদের মধ্যে যিনি অন্যতম, তাঁর কাছ থেকে এমন একটা অবাস্তব কথা আমরা শোনবার আশা করি নি। কুমার-সম্ভব পাঠ, সাধনাকে কি পরিমাণে অগ্রসর করিয়ে দেয় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিরাই জানেন; তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, দেশের লোকে কুমার-সম্ভব ও বৈষ্ণব পদাবলী যদি পড়েই, তবে সেটা আশ্চর্য্যরকম গোপন রাখে। সমালোচকেরা বলেন, বিদেশীভাব যার বস্তু, এবং বিলিতি ভাবাপন্ন লেখক যার স্রষ্টা, সে সাহিত্য কখনও টিঁকবে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে যারা সব চেয়ে উত্তেজিত, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাদের মুখেও যখন এ কথা শুনি, তখন অবাক হয়ে যেতে হয়। কারণ ও-সমালোচনা বাঙলা সাহিত্যের প্রতি যেমন প্রয়োগ করা চলে, রাজনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি প্রযুজ্য।

আমাদের সাহিত্যে ইংরাজী সাহিত্যের ছায়া যদি পড়ে, তবে তাকে অনুকরণ বলা যায় না ; কারণ ইংরাজী-সাহিত্য সত্যই আমাদের মনকে জাগিয়ে তুলেছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কিন্তু তা সত্য নয়। হোমরুল বলে আমরা যতই চেঁচাই না কেন, স্বাধীনতা অথবা ডিমোক্রেসীর যথার্থ স্বরূপ আমাদের মনে তেমন করে বসে নি,—প্রমাণ Patel bill-এর বিরুদ্ধে বাঙলাদেশের অধিকাংশ হোমরুলবাদীর সরব ও নীরব আপত্তি।

(৪)

এই খাঁটি বঙ্গবাসীটি কি সাহিত্যে, কি সমাজ-সংস্কারে, কি রাজনীতিতে একটি বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্যে অনেক সমালোচক এঁর মনস্তত্ত্বের দিকে চোখ রেখেই কাব্য সমালোচনা করেন ;—সমাজ-সংস্কারে এঁরাই হচ্ছেন সনাতনপন্থী, আবার রাজনীতিতে এঁরাই হচ্ছেন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজের মনের মানুষ। ইংরাজী-শিক্ষিত লোকেরা যে সংখ্যায় অল্প এবং দেশের যে তারা কেউ নয়, এ সম্বন্ধে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর জীবদেরই এক মত।

এই খাঁটি বাঙালীটি যে কে, তা বোঝা শক্ত, তবে কে যে খাঁটি বাঙালী নয়, সেটা বাঙলা কাগজের সাহায্যে আমরা কতকটা বুঝতে পেরেছি। যে ইংরাজী পড়েছে, যে সহরে থাকে, যে ইষ্টিমারে পাঁউরুটি অথবা রেলগাড়ীতে চা খায়, প্রাচীন ঋষিদের শিক্ষা সত্ত্বেও যে বিশ্বাস করে না যে বাসুকী মাথায় করে পৃথিবীকে বহন করছে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ বেরিয়েছে ; অথবা যে পাষণ্ড হাঁচি,

টিকটিকি, পাঁজি মানে না, অথবা মনে না মেনেও মুখে মানি বলে না, সে খাঁটি বাঙ্গালী নয়। ইংরাজী পড়ে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। হায়! এ সবই যদি না মানলে, তবে হও না কেন স্বাধীন,—জাতীয় বিশিষ্টতা রইল কোথায়? আজ যদি য়েচ্ছের মত তোমরাও বলতে আরম্ভ করলে যে, মানুষে মানুষে প্রভেদ নেই,—অবশ্য আধ্যাত্মিক ভাবে আমরাও ও-কথাটা বলেছি—"তবে হে ভাই বাঙ্গালী, আর্য্যসন্তান বিশ্বের সম্মুখে কোন্ গর্ব্বে উন্নতশিরে দাঁড়াইবে? ইত্যাদি।"

(৫)

খাঁটি বাঙালীর যে আদর্শটা আমাদের সামনে ধরা হয়, সেটা হচ্ছে পলাশীযুদ্ধের ঠিক আগেকার দিনের বাঙালীর মূর্ত্তি। তাদের ছিল বাগানে আম, পুকুরে মাছ, গোয়ালে গরু এবং ঘরে দুই স্ত্রী। ভূত-প্রেত, মন্ত্র-তন্ত্র, দেব-দ্বিজের প্রতি তাদের যথেষ্ট ভক্তি ছিল। দেশ তখন বরফ, লেমোনেড, সোডার বন্যায় প্লাবিত হয়ে যায় নি; অবশ্য দেশী বারুণীর অনাটন ছিল না—প্রাচীন ভারতে কোন-কিছুর যে অনাটন থাকতে পারে, এ কথা একেবারে অবিশ্বাস্য। ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট জনহীন পল্লীগ্রামের গভীর শান্তি,—যা সরিকি-মামলা ধোপা-নাপিত বন্ধ প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপার ভিন্ন কদাচিৎ ভঙ্গ হয়—সেই জ্ঞানহীন কর্ম্মহীন শান্তি যাঁদের আদর্শ, তাঁরা যদি এই প্রাক্‌ব্রিটিশ-যুগের বাঙালী ও তার জীবনযাপনের প্রশংসা করেন, তা সহ্য করা যায়; কিন্তু দেশভক্তি ও দেশের উন্নতির আশা যাঁদের মনে আছে, তাঁরা যখন মীরজাফর ও রাজবল্লভের বাঙলাকে আদর্শ বলে প্রচার

করেন, তখন স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, বিবেকানন্দ, প্রফুল্লচন্দ্রের বাঙলাকে তুচ্ছ করে,—মীরজাফর, রায়দুর্লভ, নন্দকুমার, এমন কি ভারতচন্দ্র, মুকুন্দ-রামের বাঙলাকে আদর্শ করাটা আর যাই হোক দেশভক্তির পরিচায়ক নয়। প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগের সাহিত্য থেকে একটি খাঁটি বাঙালীকে আমি খুঁজে বার করেছি। তিনি হচ্ছেন ভারতচন্দ্রের ভবানন্দ মজুমদার। প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে গিয়ে বন্যায় মানসিংহের সসৈন্যে মারা যাবার উপক্রম হয়েছিল—সে ঝড় জল বন্যা বড় সোজা নয়—ঘোড়া, হাতী, উট, উটের গাড়ী ডুবতে আরম্ভ করল। এ হেন দুর্যোগে ভবানন্দ মজুমদার ভেট নিয়ে উপস্থিত হলেন, মানসিংহের শিবিরে। ওদিকে প্রতাপাদিত্য কিন্তু মানসিংহের শিষ্টাচারের পরিবর্ত্তে নিতান্ত অশিষ্ট ব্যবহার করলেন।

"প্রতাপ-আদিত্য রাজা তলবার লয়ে।
বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে॥
কহ গিয়া আরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥"

ফলে প্রতাপাদিত্যকে পিঞ্জরে ভরে নিয়ে গেল। অবশ্য দেবতার প্রসাদে ভবানন্দ রাজ্য পেলেন। বাপমাকে প্রণাম করে', দুই নারী সম্ভাষণ করে', মানসিংহের সঙ্গে তিনি দিল্লী চল্লেন। পথে যত দেব দেবী ছিল ভবানন্দ তাঁদের প্রণাম ও পূজা করতে করতে এগুতে লাগলেন।

"গজে মানসিংহ পালকীতে মজুন্দার
ইন্দ্র সঙ্গে যেমন কুবের অবতার।"

দিল্লীতে পৌঁছবার পূর্ব্বেই প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হল। এদিকে ভবানন্দও বাদসাহের দরবারে বিপদে পড়ে গেলেন। দিল্লীতে যা ঘটল তাতে দেখা গেল, ভৃত্য দাসু-বাসু মনিব ভবানন্দের চেয়েও ছিল অনেক বেশী খাঁটি বাঙালী।

"দাসু বলে বাসু ভাই পলাইয়া চল যাই
কি হইবে বিদেশে মরিলে
বিস্তর চাকুরী পাব বিস্তর পরিব খাব
কোনরূপে পরাণ থাকিলে

* * * *

হেদে বামণের ছেলে আগু পাছু নাহি চলে
দিল্লী আইল রাজাই করিতে
দুধে ভাতে ভাল ছিল হেন বুদ্ধি কেটা দিল
পাতশার দেওয়ানে আসিতে।"

বলা বাহুল্য, দাসু-বাসুর বাঙালী-গর্ব্ব বড় কম ছিল না, তারা বলত—

"গাঁজাখোর রাজপুত আফিঙ্গেতে মজবুত"

যাই হোক ভবানন্দ বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে, রাজস্ব লাভ করে ঘরে ফিরে গেলেন। দেবদ্বিজ, বাদসাহ, সকলকে ভক্তি করে, দুই স্ত্রীর মধ্যে সমান ভাগে ভালবাসা বিতরণ করে, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় খেয়ে আনন্দে ও শান্তিতে দিন কাটাতে লাগলেন, এবং মরে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

(৬)

কিন্তু খাঁটি-বাঙালী-ভক্তরা নিরাশ হবেন না—পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিষ সকলের দেহমনকে জর্জ্জরিত করে নি। খাঁটি বাঙালী এখনও পাওয়া যায়—ঢের পাওয়া যায়। আমাদের গ্রামের নরহরি ভট্টাচার্য্যের দুটি পুত্রই যে খাঁটি বাঙালী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাপে পৌরহিত্য করে যে জোত-জমা করেছিল, তারি উপসত্ব তারা বেশ প্রশান্ত মনে খাচ্ছে। যদিও ছোট ছেলে প্রাণনাথের নামটা নবেলি-ধরণের, এবং যদিও সে গ্রামের এণ্ট্রান্স স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর নামের খাতায় অনেকদিন নাম রেখেছিল, তবু ইংরাজী কেন, কোন শিক্ষাই তাদের মনের কোন পরিবর্ত্তন করতে পারে নি। তামাক ও গাঁজা যদিও তারা বহুদিন হ'ল খেতে শিখেছে, কিন্তু চুরুট, পাঁউরুটি তারা কখনও খায় না, এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি। আজকাল ভদ্র ও সাধারণ লোকের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, ভট্টাচার্য্যপুত্রদের আচারে ব্যবহারে সে পার্থক্য দেখা যায় না; এমন কি বলতে গেলে, নিরক্ষর লোকদের সঙ্গে তাদের কোনই পার্থক্য নেই। বিশ্ব-সমস্যাই বল, দেশের কথাই বল, এ সব কথা কোনদিন তাদের মনকে উৎখেত করে নি। বস্তুত তাদের মনে গভীর শান্তি বিরাজ করছে। আমার বিশ্বাস সব গ্রামেই এমন খাঁটি বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ অনায়াসেই পাওয়া যাবে।

(৭)

এহেন খাঁটি বাঙ্গালীকে নব বঙ্গ-সাহিত্য যে একেবারেই আমল দেয় নি, একথা অস্বীকার করবার জো নেই। গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা,

ধারাপাত ও সচিত্র বাল্যশিক্ষা ভিন্ন এমন কোন বই বাংলা-সাহিত্যে নেই, যা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ হ'তে আরম্ভ করে' ভজহরি, প্রাণনাথ এবং মুদি চাষী প্রভৃতি রসজ্ঞ ব্যক্তি পর্য্যন্ত পড়ে সমান আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। তারপর বইয়ের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমাদের সমালোচকদের একটা খুব বড় test হচ্ছে, সে বই পড়ে লোকের উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে ইচ্ছা যায় কিনা। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন কোন একখানি পুস্তক-প্রশংসায় বলেছেন—"ইংরাজী বাঙ্গালা অনেক গল্প পড়িয়াছি, কোন কোন স্থলে চক্ষের জলও ফেলিতে হইয়াছে। পরন্তু.....পাঠ করিতে বসিয়া স্থানে স্থানে, বিশেষ শেষকালে যে ভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইল, তাহা এক নূতন ধরণের"—বোধ করি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে হয়েছিল। এ পরীক্ষায়, গুপ্ত-প্রেশ পঞ্জিকা উত্তীর্ণ না হোক, বাল্যশিক্ষা ও ধারাপাত যে হয়, একথা নিজের পঠদ্দশা স্মরণ ক'রে কোনও হৃদয়বান সমালোচকই অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু হায়! বাবুদের বাঙলা-সাহিত্যে ও-কয়েকখানা বই বাদ দিলে, এমন বই নেই, যা ভদ্র, ইতর, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, পিতাপুত্র, গুরুশিষ্য একত্র পড়তে পারে। বাঙলা-সাহিত্যে লেখকেরা সত্যই খাঁটি বাঙালীকে একেবারে অগ্রাহ্য করেছেন। জগৎসিংহ, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, গোরা, রমেশের সঙ্গে বেচারা প্রাণনাথের যে কোন সাদৃশ্য নেই, একথা তাকে দেখলে কেউ অস্বীকার করে থাকতে পারবে না।

রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়েই দিলুম, কারণ এ সব সমালোচকের লক্ষ্যই হচ্ছেন তিনি,—যদিও তাঁর ছোট গল্পে বাঙলা দেশের পল্লীগ্রামের যে ছবি আছে, বঙ্গসাহিত্যে তা দুর্লভ। বাঙলা লেখকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাঙলার পল্লীসমাজের সহিত পরিচয় যে খুব ঘনিষ্ঠ, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু দেখতে পাই খাঁটি বাঙ্গালী ও পল্লীগ্রামের সমাজ ও শান্তি প্রভৃতিকে তিনি যে রঙে চিত্রিত করেছেন, সেও বড় উজ্জ্বল নয়।

(৭)

পূর্ব্বেই বলেছি দেশে যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চলছে, তার প্রতি এই খাঁটি বাঙালীর কোন সহানুভূতি নেই। কংগ্রেস বল, কন্‌ফারেন্স বল, স্বায়ত্তশাসন বল, আর স্বরাজই বল, তারা তার কিছুই চায় না। অথচ এ নিয়ে আমাদের লজ্জার অবধি নেই। দেশের শতকরা ষাট জন নিরক্ষর লোক জীবনে স্বাধীনতার চেয়ে যদি জড়তাকে বড় করে জানেই, তাতে করে কি প্রমাণ হয় যে, স্বাধীনতার আদর্শ মিথ্যা আদর্শ? সত্য কথা এই যে, খই, বাতাসা, মুড়ি-চাকতির মাঝে বসে চিত্রাঙ্গদা পড়া চলবে না—বিলিতি greengrocer-এর শাক-সবজীর মাঝখানে বসে Hamlet অথবা Ode to a Nightingale, এমন কি Galsworthy-র Strifeও পড়া চলবে না, তা তাতে শ্রম-জীবির জীবনের যতই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ থাক না কেন।

আমাদের সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার মুদি-বাখালির মনের মাপে ছেঁটে কেটে ফেলতে হবে, এ হুকুম আমাদের মানা চলবে না। হলধর দাস বা রহিম সেখ যতই খাঁটি বাঙালী হোক না কেন, তাদের চিন্তা বাঙালী জাতির এ যুগের চিন্তা নয়, তাদের আদর্শ বাঙালী জাতির আদর্শ নয়। একদিন শিক্ষিত বাঙালীর আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা

দেশের আপামর সাধারণের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে, এ আশা আমরাও পোষণ করি; কিন্তু তাই বলে এখন তারা যা বুঝতে পারে না, তাকেই বিজাতীয় বলে অপমান করতে আমরা প্রস্তুত নই।

বাঙালীর সুদূর অতীত আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়;—প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগের যে অতীতটুকু স্পষ্ট, তার গর্ব্ব করে অজ্ঞতার পরিচয় না দেওয়াই ভাল। রামমোহন হ'তে আরম্ভ করে আজও বাঙালীর জাতীয় জীবনের যে অধ্যায় চল্‌ছে, তা অতীতের কোন অধ্যায়ের চেয়ে গৌরবে কম নয়। বাঙলার কবি, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম; বাঙলার বৈজ্ঞানিক দেশ দেশান্তরে সম্মানিত; যে বাঙালীর ছেলে ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘর ছাড়ে নি, সে হঠাৎ ইউফ্রেটিসের তীরে, ভার্ডুনের নগর-প্রাকারে মহাযুদ্ধে প্রাণ দিতে ছুটল। অর্দ্ধোদয় যোগে, দামোদরের বন্যায়, দেশের আপদে বিপদের দিনে বাঙালীর ছেলের যে মূর্ত্তি আমরা দেখেছি, বাঙলার প্রাচীন ইতিহাসে বাঙালীর সে মূর্ত্তি আমরা কখনও দেখি নি—ভবানন্দের সঙ্গে তুলনা করে তাদের খাটো করতে চাই নে।

আজ পাঁচ বৎসরব্যাপী মহাসমরের শেষে ইউরোপে সিংহাসনের পর সিংহাসন টলে পড়েছে, হাজার বছরের পুঞ্জীভূত অত্যাচারের ফলে একছত্র সম্রাটের রাজমুকুট ধূলায় খসে পড়েছে। দীন, মূক হয়ে যারা পুরুষপরম্পরায় নানাবিধ অত্যাচার সহ্য করেছে, আজ তারা মুক্তির সন্ধানে শতশতাব্দীর বন্ধন ছিন্ন করে যাত্রা করেছে—দুঃখকে স্বীকার করে, বিপদকে তুচ্ছ করে। আর আজকের দিনে বাঙালীই কি কেবল আমবাগানের শান্তি, চণ্ডীমণ্ডপের আধ্যাত্মিক গল্পে মজে থাকবে? ডিমের খোলসটা একদিন তাকে বাইরে থেকে রক্ষা

করেছে বলে কি পাখী চিরকালই সেই সনাতন খোলসটার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে? শত বিহঙ্গের কলধ্বনিতে আজ যে প্রভাত-সূর্য্যের আবাহন আরম্ভ হয়েছে—মুক্ত হাওয়ায়, সুদূর বনান্তের নীল রেখায়, আকাশের উচ্চতম সাদা মেঘের কোল থেকে মুক্তির যে আহ্বান আসছে, সে কি বাঙালীর কাছ থেকে অনাদরে ফিরে যাবে?

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

পাটেল-বিল্ *

—:*:—

অসবর্ণ বিয়ের কথা মহাত্মা পাটেল যেম্‌নি উত্থাপন করেছেন, অম্‌নি দেখা গেল, বুড়ো-বাঙলা বাইরে থেকে ধার-করে-আনা টোপর মাথায় দিয়ে গড়ের মাঠের সমাধিস্তম্ভটির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কেবলি ঘাড় নাড়তে লাগলো—না-না-না! এরা মৃত্যুকেই চায়! পাঁচকে অনেক খানি মিথ্যে এবং অনেকগুলো শূন্যের উপরে খাড়া কোরে কবর ও হাড়কাঠ—দুটোই সাক্ষী রেখে পাড়াপড়সির সে দিনের রামলীলায় সমস্ত বাঙলা যোগ দিয়েছে, কাগজের ঢাক-পিটিয়ে এই যে মিথ্যে কথাটা জগতে প্রচার করবার চেষ্টা হচ্ছে, সেটা অপ্রমাণ করা চাই। বুড়োর দলকে বাঙলার মাথায় এই উপহাস কিছুতেই চাপাতে দেওয়া নয়। বুড়োরাই তো বাঙলার সবখানি নয়! সবদিক দিয়েই নতুন বাঙলা আপনার কথা, আপনার আশা-ভরসা নিয়ে জগতের সাম্‌নে এসেছে। তাকে উড়িয়ে দেওয়া কোনো সভাপণ্ডিত বা কোনো সনাতন মোড়লের সাধ্য নেই। আমরা জানি মাঠের গোরুটার কাছ থেকে এবং শ্মশানের মশানের কাছ থেকে যে অসম্মতির চীৎকার শোনা যাচ্ছে, সেটা অসবর্ণ বিয়েতে সারা বাঙলার মানুষদের অসম্মতি বোলে কোথাও গ্রাহ্য হবে না। অসবর্ণ বিয়ে করবে দেশের সাহসী

* কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌সটিটিউট হলে পাটেল-বিলের সমর্থন-সভায় সভাপতির বক্তৃতা।

যুবক-দল। বিয়ে দেবে তার চেয়েও অসম-সাহসী মেয়ের বাপ-মা। আইন হচ্ছে তাদের নিরাপদে থাকার জন্য। পাড়ার বুড়ো এবং পড়সী মোড়লদের ঘুমের ব্যাঘাত কেন হবে? এবং এ-নিয়ে তারা চেঁচামেচি করবেই বা কেন?

বাঙালীর সমাজের সম্মতি-অসম্মতির জানাবার জন্যে বেহার থেকে সভাপতি ধরে আনায়, এদের সভার অসম্মতি খুব যে পাকা-রকমের, তার পরিচয় তো পাওয়া যায় না।

সুখের বিষয়, সারা বাঙলার নামে বুড়োর দলের সে দিনকার সভায় বাইশখানা বক্তার আসনের মধ্যে একুশখানাই খালি পড়েছিল—সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত দেখেছি। শুনেছি তারপর অন্ধকারে পঞ্চাশ-হাজার সেখানে কীর্ত্তন ও আইনের কর্ত্তন করবার জন্যে জুটেছিল এবং সহরের রাস্তায় কোনো গোলযোগ না ঘটিয়ে সাড়ে-ছ'টার ট্রাম ধর্ম্মতলায় লাগবামাত্র তাতে চড়ে ঘরে গিয়েছিল—এত চটপট্ যে কেউ তাদের দেখে নি। বায়স্কোপের চেয়েও সচল অথচ সজীব নয় এমন ছবির মতো এই একটা মহাসভার জনতা যা এল এবং গেল, শুনেছি, তাকে সত্যিকার বলে সহজেই বিশ্বাস হয়তো খবরের কাগজ পড়ে অনেকেই করছেন। কিন্তু দেশের গতিবিধির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এই অসবর্ণ বিয়ের আইন যাঁরা করতে চলেছেন, ধর্ম্মতলার এ কারসাজিটা তাঁদের চোখে ধুলো দিতে পারবে না, আশা করা যায়।

এই আইন পাশ হবার পূর্ব্বে যে-দলের যা বল্‌বার, সেটা ব্যক্ত কর্‌বার স্বাধীনতা সবারই আছে। সে দিনের লোকেরা সে দিনের ও সে দিকের কথা বোলে প্রেতাত্মাদের নিশ্চিন্ত করে ছেড়েছেন; এখন এদিনের লোক ইহকালের ব্যবস্থাটা করে না-নিয়ে, অচল হয়ে

বসে থাক্‌বে—কেবলই ভূতপূর্ব্বদের ভাবনা ভেবে, এটাই বা কেমন করে আশা করা যায়? বিশেষত যখন বিয়ে নিয়ে কথা উঠেছে।

একদিকে পাহারা দিচ্ছে টোলের সশিষ্য পণ্ডিত, আর-একদিকে ততোধিক পণ্ডিত মোড়ল-মহাশয়েরা, মধ্যে রয়েছে হিন্দুমাত্রেই। এইটেই কি ঠিক? না, এটাও ঠিক যে দুই-দুই জমাদারের সব ধম্‌কানি, সব চাপন সময়ে-সময়ে অগ্রাহ্য কোরে ঠেলে ফেলে সমাজে বন্দী অথচ স্বাধীন-চেতা, তাঁরা মানুষকে চিতার আগুন এবং আজীবন চিতার চেয়েও ভয়ঙ্কর জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার উপায় নিজের শক্তিতে কোরে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছেন। সমাজের জমাদারের সঙ্গে, যাদের নিয়ে সমাজ ও যাদের নিয়ে জাত, তাদের লড়াই ইতি-পূর্ব্বে হয়ে গেছে এবং হবেও—জাতির কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য। বিদ্রোহের আগুন সমাজের মধ্যে মাঝে মাঝে যে জ্বলে তা নিবারণের উপায় মনুসংহিতার পুঁথি পুড়িয়ে ছাই-চাপা দেওয়া নয়,—যাতে জ্বালা নিবারণ হয় তাই করা।

জ্বালার উপর জ্বালা দেবার জন্যে যখন দরোয়ান রয়েছে, এবং যন্ত্রণা সয়েও দরোয়ানদের আশীর্ব্বাদ করবার লোকও রয়েছে যখন যথেষ্ট, তখন যে-আইন পুরস্কার, সেটাকে তিরস্কার বোলে কতক লোকে নেবে, তার আর আশ্চর্য্য কি! সরকারি আইনের সাহায্য নিয়ে সমাজ-সংস্কার একদল অপছন্দ করছেন। অবশ্য নিজেদের ঘর নিজেরা গুছিয়ে নিতে পারলেই ভালো; কিন্তু যতদিন জমাদার ক'জন দরজায় থেকেও প্রভুত্ব খাটাচ্ছে, ততদিন ঘর এবং ঘরের লোকেও যে তাদের খপ্পরে বন্দী এ-কথাটা যদি সত্যি না হতো, তবে অন্য-সব ব্যাপারে যাঁরা সদর্পে সদম্ভে অগ্রসর ও নেতা হতে ব্যস্ত,

তাঁরা এ সময়ে আইনের স্বপক্ষ-দলকে মিষ্টি কথায় গোপনে সহানুভূতি জানিয়ে বিদায় কোরে নিজের সাফাইয়ের পথ পরিষ্কার রাখতে ব্যস্ত হতেন না! এবং বুড়োদের খবরের কাগজে কেবল বিপক্ষ-দলের সভার খবরগুলো বার করবার ও স্বপক্ষদের খবর চেপে যাবার চেষ্টা চল্‌তো না। হিন্দু-সমাজের দরোয়ান ক'জন যদি শুধু পাহারওয়ালা হতো, তবে তাদের হাতে হিন্দু-সমাজ এ-পর্য্যন্ত যা সয়েছে ও সইছে তার শোধ নিশ্চয় নিতো—খুনোখুনি ব্যাপার কোরে। কিন্তু জমাদারগুলো বন্দীদের সঙ্গে নানা কুটুম্বিতা, আত্মীয়তা পাতিয়ে বসেছে, যে, তাদের সঙ্গে ঝগড়া কোরে বন্দীদের দিন চলা দায়! ধোবা-নাপিত বন্ধ হতে পারে, জাতঃপাত থেকে আরম্ভ কোরে নির্য্যাতন যে কতটা এগোতে না-পারে তার ঠিক কি! কাজেই হিন্দু-সমাজ নিজের ভিতর থেকে যে আপনার ক্ষত আপনি শুধ্‌রে নেবে, তার আশা খুবই কম। ডাক্তার সাহেবের দরকার আছেই-আছে। ভিতরটা যখন এমন অপটু যে ভিতরের রোগ নিজে দূর কোরে দেবার সাধ্য নেই, তখন বাইরের বোলে ডাক্তারের চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে শুধু তো গঙ্গোদকে নির্ভর কোরে নেতারাও একদিন থাকেন না! তবে এ ক্ষেত্রে কেন যে তাঁরা আমাদের আর-এক মনুর জন্মানো পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে বলছেন তা বোঝা যায় না! বড়-কবিরাজের অনিশ্চিত আগমনের আশা ও ধৈর্য্য যতখানি তাঁদের আছে, বেচারা রোগীর জীবন ততখানি অপেক্ষা করতে চাইবে কি না বলা যায় না। আমার ভয় হয় তাঁরা যখন কবিরাজ এনে হাজির করবেন, তখন দেখা যাবে এদেশে সমাজটি ঠিক শিবেরও অসাধ্য অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে!

অসবর্ণ বিয়ের আইন পাশ হলেই যে দেশসুদ্ধ কোমর বেঁধে সেই

কাজে লেগে যাবে, সে-আশা খুবই কম। সতীদাহ-আইনের পশ্চাতে বৃটিশ-রাজশক্তি ও ইচ্ছা ছিল। কাজেই সে শুভ কাজটা চট্ করে নির্ব্বাহ হয়ে গেল। কিন্তু বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ—এম্‌নি সব আইনগুলির সঙ্গে মুখ্যভাবে আমাদের নিজশক্তির ও ইচ্ছার যোগ। সতীদাহ ধর্‌তে গেলে সাহেবরা বন্ধ করেছেন—সতীকে আগুনের মুখ থেকে জোর করে টেনে এনে এবং ধর্ম্মের নামে নরহত্যাকারীদের কঠিন শাস্তি দিয়ে। বিয়ের আইনের বেলায় তো তা হবার যো নেই। কাজেই বালিকা-বিধবার দুঃখ ঘুচ্‌তে, চারবর্ণের আত্মীয়তা বাড়তে নিশ্চয় আরো-গোটা-কয়েক যুগ কেটে যাবে, ভাবনা নেই। তবে এ-আইন হ'লে আপাতত এইটুকু লাভ হবে—কড়া পাহারা শিথিল হবে, জেলখানার নিরেট দেয়ালে আর-একটা ফাঁক বাড়বে, দুই জমাদারের অযথা ধমক মান্‌তে না চাইলে যাদের এদেশে টিঁকে থাকা, এমন কি পৃথিবীতে টিঁকে থাকা দায় ছিল, তারা রক্ষা পাবে; এরা জাত-হাড়কাঠের কাছে মানুষকে পশুর মতো যখন-খুসি যেমন-খুসি ধোরে-ধোরে গলা-কাটতে পারবে না; আর ছেলের বাজারও কিছু সস্তা হবে।

হিন্দুসমাজের দরজার বাইরে দরওয়ানদের যতই দাপট থাক, এটা নিশ্চয় যে মনুর আমলের খাঁচা-কলের অনেকগুলো কাঠি ও খিল ভেঙে, খাঁচার মধ্যেকার পূর্ণতা ক্রমেই কমে চলেছে। এবং বেরিয়ে যারা যাচ্ছে, বাইরে থেকে ফিরে এসে সেই খাঁচা-কলের পূর্ণতা পুনরায় ভর্ত্তি করবার জন্যে তারা মোটেই ব্যস্ত হচ্ছে না। এতে যদি কারু মনকষ্ট হয় তো সে মনুর; এবং অন্ন-যাবার ভয় যদি কারু হয় তো সে আমাদের দরোয়ানগুলোর।

একালে মনু যদি বর্ত্তমান থাকতে পার্ত্তেন, তবে হয়তো তাঁর কলটা তিনি মেরামৎ কোরে, শুধরে এখনকার উপযোগী কোরে নিতে পার্ত্তেন। কিন্তু মনু নেই—যিনি বানালেন খাঁচা ও খুটিনাটি; রয়েছে কেবল ভাঙা খাঁচায়-ধরা মানুষগুলি; এবং দরজায় মনুর আমলের থেকে বহাল-করা দরোয়ানীর উপযুক্ত জন-দুই;—যাদের কলকব্জা-জ্ঞান কয়েদী যারা, তাদের চেয়েও কম। তারা বংশানুক্রমে এ-পর্য্যন্ত ধম্‌কেই এসেছে এবং সেইটেতেই তারা মজ্‌বুদ্। এ-ক্ষেত্রে মন্বন্তর পর্য্যন্ত খাঁচা-কলের কোনো ব্যবস্থা হওয়া কঠিন; এবং কয়েদীর সব-ক'টিকেও সেখানে ধোরে রাখা শক্ত—যদিনা কয়েদা স্বইচ্ছায় স্বস্থানে থাকে এমন-একটা ব্যবস্থা করা না হয়। হ'লে তারা ফাঁক পেলেই পালাবে এবং খাঁচার শিক আরো ফাঁক হয়—এই প্রার্থনাই বৃটিশ-গভর্মেণ্টকে জানাবে।

'কিংকর্ত্তব্য'? এই-জাতীয় একটা সমস্যার মীমাংসা একবার সত্যিকার পাখীদের নিয়ে আমাকে করতে হয়েছিল। একসময়ে খাঁচার দরজায় ডবল-তালা লাগিয়ে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য পাখীকে আমি লালন-পালন করেছিলেম। খাঁচাটা ছিল বহুকালের; কাজেই পাখী সেখানে তালাসত্ত্বেও আস্তে আস্তে কম্‌তে লাগল। আজ এ-ফাঁক বন্ধ করি, কাল ও-ফাঁক দিয়ে পাখী পালায়; অথবা নিজেরাই নতুন-নতুন ফাঁক আবিষ্কার করে। যারা পালায় তারা দেশ ছেড়ে, নয়তো পাখী-লীলা সাঙ্গ করেই পালায়। সব যায় দেখে 'অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'-বুদ্ধিই আমি করলেম। খাঁচাটাকে আর খাঁচা রাখলেম না। ডবল তালা সরিয়ে সেটাকে আশ্রয় এবং আহারের স্থান, আর সমস্ত-বাগানটাকে পাখীদের বিহারের স্থান করে দিয়ে আমি সরে

দাঁড়ালেম। দেখলেম তখন পাখীরা ইচ্ছাসুখে খাঁচার মধ্যে আনাগোনা কর্‌তে লাগলো এবং আমার বাগান ছেড়ে আর কোথাও নড়া আর প্রয়োজন বলেই বোধ কর্‌লে না। শুধু যে এতে পোষা-পাখীরাই কাছে রইল তা নয়, বাইরেরও পাখী নিকটে পেতে আমাকে কোনো মায়াজালই বিস্তার করতে হ'ল না। হিন্দু-সমাজে খাঁচা-ও-কলে-পড়াদের জন্য উপরের মতো কিছু-একটা ব্যবস্থা ভালো কি মন্দ তা ন্যায়-বাগীশেরা বুঝেন; আমি যখন ব্যাধ নই, তখন ফাঁদ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে ফাঁদেরও দুরবস্থা, নিজেরও বিপদ ঘটা সম্ভব। কিন্তু এটা ঠিক যে হিন্দু-সমাজের চাবি কতকটা খুলে গেলে সমাজ পরিত্যাগ কোরে যারা বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছে বা অন্য সমাজে গিয়ে মিলছে, তাদের আর সেটা করবার কারণ থাকবে না। কিন্তু ঐ দুই দরোয়ান—দরজার সঙ্গে যাদের দরোয়ানীও যায়, তারা বলবে—ডবলের উপরেও ডবল তালা নইলে চল্‌ছে না, হুজুর।

চারবর্ণ এ-ওর সঙ্গে মেলবার সুযোগ পেলে হিন্দু-সমাজের চেহারা কতকটা যে বদ্‌লে যাবে, তার সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-বদলটা যে খুব ভীষণ-আকারের একটা-কিছু হবে, তাতো মনে হয় না। চারবর্ণ কেন, রামধনুকের সব-ক'টা বর্ণ নিয়েই আমি বাল্যকাল থেকে এ-পর্য্যন্ত কারবার করে আসছি। এটা দেখেছি বর্ণকে স্বস্ব-স্থানে অমিশ্র-অবস্থায় রেখে চালচিত্র পর্য্যন্ত করা চলে, তার উপরে আর ওঠা যায় না। জীবন্ত ছবির বেলায় এক বর্ণকে আর-এক বর্ণে না মেলালে উপায় নেই।

এই আইন যদি-বা পাশ হয়, তবে এদেশের জল-হাওয়ার গুণে তার ফল ফলতে এত বিলম্ব হবে যে, ততদিন খুব-বুড়োর দল নিশ্চয়ই

লোপ পাবে; সুতরাং তাঁরা নির্ভয়ে থাকুন। ভয় কেবল তাঁদেরই, যারা কচি-বয়েস থেকেই প্রেতলোকের ভাবনা খুব বেশি-কোরে ভেবে মাথা ধরাচ্ছে।

আর আমরা—যারা এই অসবর্ণ বিয়ের সমর্থন করতে এসেছি, আমাদেরও যে কোনো ভয় নেই, তা কেমন কোরে বলি, যখন অপর-পক্ষের হাতে কাগজের খাঁড়ায় এখনি শান্ পড়ছে জান্‌ছি; এবং জান্‌ছি ভালোবাসা, আত্মীয়তা, বন্ধুতা এম্‌নি সব সোনার কৌটার ভিতর কৌটার মধ্যে যেখানে আমাদের প্রাণটুকু লুকিয়ে রেখেছি, সেখানেও ঘুণ-ধরবার পরামর্শ গোপনে চলেছে—এরি মধ্যে।

এই ঘুণ এবং কাগজের খাঁড়া—দুটোই আমাদের সোনার ঘরের আশেপাশে অনেকবার দাঁত বসিয়ে বুড়োদেরই মতো এমন ভয়ঙ্কর ফোগ্‌লা হয়ে পড়েছে যে, অনায়াসে সে-দুটোকে আমরা উপেক্ষা করে যেতে পারি—নতুন কোরে অস্ত্র-আইনের দরখাস্ত না লিখে। প্রাচীনের দলকে এটা আমাদের স্পষ্ট করে বোলতে হবে যে, চীনের প্রাচীরের মধ্যে বাঁধা থেকে আমরা মরতে রাজি নই এবং তোমাদের জাতরূপী-জাঁতাকলের মুঠো হয়ে নিজের জাতকে নিজেরা পিশে মারতেও রাজি নই।

খুব নরম কোরে বল্লেও, অসবর্ণ বিয়ের সমর্থন কোরে যতগুলো সভা, সবগুলোকেই বিপক্ষ-দলের কাগজগুলো বল্‌বে নাস্তিকের সভা; —যদি-না এই-সব স্বপক্ষ-সভার বিবরণ ঘুণাক্ষরেও প্রকাশের সৎসাহস দেখাতে সাধারণ খবরের পেয়াদা যে সম্পাদকরা এ পর্য্যন্ত যা কোরে আসছে, তা না করে—অর্থাৎ তাদের কাগজটা দেশের সবদিকের সব-রকমের খবরের জন্যে নয়, কিন্তু নিজেদের ঘরে পয়সা মুড়ে আন্‌বার

থলি প্রস্তুতের জন্য, এইটেই মনে না করে। আর খুব গরম কোরে যদি আমাদের কোন খবরের কাগজে এই আইনের বিপক্ষ-দলের গালাগালির প্রতিবাদ করা চলে, তবে ভদ্রলোক এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারে—"ন নাস্তিকানাং বচনং ব্রবীম্যহং। ন নাস্তিকোঽহং ন চ নাস্তি কিঞ্চন। সমীক্ষ্য কালং পুনরাস্তিকোঽভবং, ভবেয় কালে পুনরেব নাস্তিকঃ।" ওগো আমরা নাস্তিকও নই, অহিন্দুও নই, এবং তোমাদেরই মতো আমরাও পরলোকের বিষয় চিন্তা কোরে থাকি; কিন্তু সময় এসেছে যখন নাস্তিক হতে হবে—"স চাপি কালোঽয়-মুপাগতঃ শনৈর্যথা ময়া নাস্তিকবাগুদীরিতা।"—এমন সময় এসেছে তোমরা যাতে ভালোমানুষটি বল্‌বে এমন-সব তোমাদের মনযোগানো কাজ কোরে জাতাসুরের জাঁতার চাপনে দেশসুদ্ধকে মর্‌তে দিলে গোলোকে স্থান দেবে বল্লেও সে কাজে আমি রাজি নই। কেননা ইহলোকের জীবন-যাত্রা তাহ'লে আমাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠবে—পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কাজেই যা বল্‌বার, তা বলতে হবে। হিন্দু-স্থানের হিন্দু একজাত নয়, কাজেইএকও নয়; কিন্তু এক হতে পারে। কেননা ইংলণ্ডে ফ্রান্সে জর্ম্মানীতে সেটা হয়েছে। ভারতবর্ষেই বা সেটা হওয়া আশ্চর্য্য কি? কিন্তু ঐ জাতের জাঁতা নিয়ত ঘুরে ঘুরে একেকে শতখণ্ডে যতদিন চূর্ণবিচূর্ণ কর্‌তে থাকবে, ততদিন সেটা কিছুতে হবে না।

সময়ের সঙ্গে যদি আমরা চলতে চাই, তবে আমাদের সমাজের পুরাতন ডিঙিখানাকে বেশ-কোরে নতুন ও মজবুৎ কোরে স্রোতে ভাসাতে হবে। মিউজিয়মের উপযুক্ত বোলে সেটাকে ডাঙায় তুলে আগ্‌লে বসে থাকলে তো চল্‌বে না! ডিঙিও চল্‌বে না, আমরাও

চল্‌বো না—যদি জল ছোঁয়া কিনা এই তর্ক নিয়েই কাল কাটাতে থাকি। যে-সব ধর্ম্মের কর্ম্মের ও চিন্তার স্রোত আমাদের কাছ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তা থেকে দূরে থাকারই পরামর্শ যাঁরা কচ্ছেন, তাঁরাও কি জানেন না যে বাণ যেদিন এসে উপস্থিত হবে—যে-অবস্থায় আছি সে-অবস্থায় থাকা আর সেদিন সম্ভব হবে না,—ভেসে যেতেই হবে এবং সে সময় অকর্ম্মা মাঝি এবং অচল ডিঙি—দুটোই বৃথা চেষ্টা কর্‌বে যাত্রীদের বাণের মুখে ভাসিয়ে রাখবার জন্যে। আমরা ডুব্‌বোই! ভব-সাগরের পারে যাবার আশায় যে-ডিঙিখানা ডাঙার উপরে নিয়ে বসেছিলুম, সেটা যখন সত্যিকার সাগরের তোড়ে চূর্ম্মার হয়ে যাবে, তখন তার ঘুণ-ধরা ফোপ্‌রা কাঠগুলো আমাদের দুই-মুঠোর চাপনে গুঁড়ো হয়ে গঙ্গামৃত্তিকার চেয়েও তরল পদার্থে পরিণত হ'বে এবং তারি বর্ণ সর্ব্বাঙ্গে মেখে আমরা চট্-কোরে রসাতলের দিকে চলে যাবো। যদি যেমন চল্‌ছে এমনি ভাবে হিন্দু-সমাজরূপ ডিঙি খানিতে একটুও অদল-বদল, একটুও সংস্কার না কোরে, জল-ছোঁয়া প্রভৃতি দরকারি কাজ থেকে একেবারে আগ্‌লে রেখে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি—ইহকাল-পরকাল, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—দুটো তাল পাকিয়ে, আজগুবি লাড়ুহাতে লাড়ুগোপালটির মতো ভালো-মানুষ সেজে, তবে ভরা-ডুবি রক্ষা হবে না। পূর্ব্বতন ঋষিদের কালে হিন্দু-সমাজের মধ্যে নানা সংস্কার নানা দিক দিয়ে আস্‌তে দেওয়া হতো বলেই, সমাজ তখন এপার ওপার দুপারেই যাত্রীদের বহন করে চলেছিল। এখন যাঁরা সমাজকে খবরদারি কর্‌তে ব্যস্ত, তাঁরা সমাজকে প্রধানত ইহকালের সুবিধা অসুবিধার জন্য না প্রস্তুত রেখে, পরকালের সাক্ষী দেবার জন্যে পোঁট্‌লা বেঁধে রাখ্‌তে চান। এটা

তাঁরা ভুলে যান যে, সমাজ হচ্ছে জীবন্ত মানুষদের নিয়ে এবং ইহ-জীবনের কাজে লাগ্‌বার জন্যেই তার বিশেষ প্রয়োজন। প্রেতলোকে গিয়ে পিণ্ড দেবার জন্য সমাজের সৃষ্টি হয় নি; ইহলোকের কাণ্ড-কারখানার জন্যই রয়েছে সমাজ; কাজেই ইহলোকের কাজে লাগাতে হলে সময়-মতো সংস্কারাদি কোরে সমাজের কল্-বল্ ঠিক রাখতে হবে, না হলে আর বেশিক্ষণ সে আমাদের কাজে আস্‌বে না। সংস্কারের দ্বারা হিন্দু-সমাজের কতটা বিপদ, সে-ভাবনার চেয়ে সংস্কারের অভাবে তার কি দুর্দ্দশা হবে সেইটেই কোরে ভাববার বিষয়। কিন্তু ভাবতে বল্লেই যাঁরা চটে উঠে মনুসংহিতা আউড়ে যান, তাঁদের সঙ্গে চেঁচিয়ে তো আমরা পারবো না। লেখালেখি করেও যে পেরে উঠি তা নয়। কেননা খবরের কাগজের প্রায় সব বাঙালী তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা পাতিয়ে বসেছে। এ অবস্থায় গভর্মেণ্টের কাছে আইনের সাহায্য না চেয়ে, মনুমেণ্টের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করে সময় নষ্ট করা বৃথা। ভিতর থেকে সমাজ-সংস্কার যখন একপ্রকার অসম্ভব, তখন বাইরে থেকেও যদি সেটা না আসে, তবে বল্‌তেই হবে ভিতরে-বাইরে আমরা একেবারেই মলেম! একমাত্র তখন বুড়োর দলের শীঘ্র বিলুপ্তির কামনা বিধাতার কাছে করা ছাড়া আর যে আমরা কি কর্‌বো ভেবে পাই না। কিন্তু হায় বিধাতা যে অভিসম্পাত দিয়ে বসেছেন যে বুড়োর দল এদেশে অনেক যুগ বাঁচবে।

কিন্তু অকস্মাৎ বোলে একজন তো আছে,—যে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়ে গেল! যার বস্‌বার কথা শ্রোতার জায়গায়, তাকে বসিয়ে দিলে সভাপতির সিংহাসনে! যখন এমন অঘটন চোখের সাম্‌নে ঘটছে, তখন হঠাৎ এই অবসর্ণ বিয়ের

বিলের সঙ্গে হিন্দু-সমাজের সংস্কারও ঘটে যেতে পারে এবং যাকে শাপ বলে ঠাউরে ছিলেম সে বর হয়েও দেখা দিতে পারে। বিয়ের আইন নিয়ে যখন লড়াই, তখন যে-পক্ষে যুবার মেলা, সেই-পক্ষেই জয়ের মালা নিশ্চয়ই এসে পড়েছে, এই বিশ্বাসেই বয়সের ধর্ম্ম না মেনেই আমি এ-দলে ভিড়েছি এবং এর জন্যে বুড়োরা হয় তো আমাকে কিছু একটা উপাধি দিয়েছেন এবং হয় তো আমার ছবি খুব জাঁকালো-রকমে কাগজে ছাপিয়ে ঘরে-ঘরে বিলি করছেন। কিম্বা দেখলেম হয়তো এর একটাও হল না; অকস্মাৎ সব উল্টেপাল্টে গিয়ে বুড়োরই গলায় পড়লো বরণ-মালা, আর আমি যে ফাঁকে সেই ফাঁকাতেই অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এসে হাঁপ্ ছাড়লেম! এই ভাবে অকস্মাৎও যদি হিন্দু-সমাজের মধ্যে একটা সংস্কার ঘটে যায়—যেমন একবার আমার এক দূর-সম্পর্কে বড়দাদার ঘটেছিল, তা হলেও ভালো। দাদার ঠাকুরদাদা ছিলেন খুব ছোটোখাটো মানুষটি। তিনি নিজের মাপে আফিস্-গাড়িখানি বানিয়েছিলেন। সেখানি খুব বুড়ো হয়ে মর্‌বার সময় নাতিকে বখ্‌শিস্ দিয়ে গেলেন। এদিকে দাদার শরীর হল তাঁর ঠাকুরদাদার চেয়ে আড়াই-গুণ লম্বা-চওড়া, কাজেই পিতামহের গাড়িখানি চড়ে-বেড়াতে তাঁর কষ্ট বাড়্‌ছিল বই কম্‌ছিল না।

আমি একদিন বল্লেম—দাদা, গাড়িখানি একটু কেটে-কুটে এদিক-ওদিক-ওদিক করে বাড়িয়ে নিন্, আরাম পাবেন। পিতামহের গাড়ি, তার উপর করাৎ চালাতে দাদার মায়া হ'ল। কেবল আমার অনেক অনুরোধে গাড়ির চারখানা চাকা মোটা লোহা আর কাঠ-কাট্‌রা দিয়ে মজবুৎ করে নিলেন। তারপর একদিন, যিনি প্রভঞ্জন,

তিনি এক ফুঁয়ে দাদার সেকেলে গাড়ির কচ্ছপের পিঠের মতো ছাদ-খানা রাস্তার মধ্যে থেকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেলেন। দাদা দেখলেম, সেই ছাদ-খোলা গাড়িতে গলির মোড়ে উপস্থিত—ছাতা-মুড়ি দিয়ে। আমি কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা কোরে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে শুধালেম—দাদা, একি কাণ্ড! দাদা খুব গম্ভীরভাবে বল্লেন—ছিল পাল্কি, হল ফেটিন্! একটু হাওয়া-খাবার আর হাত-পা ছড়িয়ে বস্‌বার সুবিধে হল! ভাগ্যি তুমি বলোছলে চাকা-চারখানা মজবুৎ রাখতে; না হলে, আজ কি বিপদই হতো।

দাদার ফিটনের মতো এই অসবর্ণ বিয়ের আইনটা সবখানি অক-স্মাতের জিম্মায় রেখে কিন্তু বাড়ী যেতে আমার সাহস হয় না। কি জানি অকস্মাৎ হয় তো বুড়োদের ভাবগতিক দেখে আমাদের রাজপুরুষেরা ভাবতে পারেন এ-আইনের সমর্থন এ-দেশের জনপ্রাণীও করে নি! তাই আমরা সবাই—যারা এখনো বুড়োদের মতো ভয়ঙ্কর বুড়ো হই নি এবং হতেও চাই নে, তারা এই সংস্কারের সমর্থন করে সোজা হাত ওঠাবো—নির্ভয়ে; কেননা জানি যে, জাতির কল্যাণের জন্য যা, তাকে সমর্থন করে হাত ওঠালে যদি যা চাই তা এখনি নাও পাই, তবু কারু কাছে লজ্জা পেতে হবে না। আর যে-হাত সবার উপরে রয়েছে সে-হাতের ইঙ্গিত মেনে যদি সংসারের সব কাজে সায় দিয়ে যেতে পারি, তবে আমাদের নিরাশও হতে হবে না—হারও মান্‌তে হবে না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেবী।

——:০:——

আমার মাতা পত্নী ভগিনীরে
আমি যদি দেবী বলেই ডাকি—
তাতে আবার সমাজ-শাসন চলে
তাতেও লোকে রাঙায় কেন আঁখি?
আমার মাতা পত্নী ভগিনীরা
জান কিগো আমার কতখানি,
সমাজ গুরু দেখেছ কি ভেবে
জাতির আভিজাত্য-অভিমানী?
চিত্ত তাদের শৈল সম উঁচু
চক্ষে তাদের জাহ্নবী যে বহে,
তোমার জানার কই অবসর প্রভু
তোমারও তা জানার কথা নহে।
তোমার মা কি আমার মায়ের চেয়ে
পুত্রস্নেহে এতই হবে কম,
দেবী বলি সম্বোধিলে তায়
হবে আমার নেহাৎ অনিয়ম।
পুণ্যবতী আমার ভগিনীর
জন্য কিগো নিয়ম নূতনতর?

তোমার প্রিয়া আমার প্রিয়া হতে
আত্মত্যাগে নয়ক কভু বড়।
এরা যদি আমার দেবী নহে
দেব্‌তা তবে কোথায় বল খুঁজি ?
এই ধরণীর স্বর্গধামে মম
পূজার লাগি এঁরাই আছেন পুঁজি।
শক্তি পেয়ে মত্ত এতই তুমি
এতই তোমার উগ্র অহঙ্কার,
পদাঘাতে ফেলতে চাহ দূরে
দেবীর লাগি পূজার উপচার !

শ্রীকালিদাস রায়।